চাঁদমামা
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭
Rs 1·25

সেকালের প্রাণীর ফসিল

কোটি কোটি বছর আগে বিরাট আকারের হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণী ছিল। কালে কালে ঐ প্রাণীর আকার বদলাতে লাগল। যেসব জন্তুর হাড়ের উপর মাটি পড়ল, সেসব হাড় ফসিল হয়ে গেল। মঙ্গোলিয়ার বহু স্থানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীনকালের অসংখ্য জন্তু জানোয়ারের হাড় পাওয়া গেছে। এমন কি যেসব নদী শুকিয়ে গেছে সেসব নদীতেও এসব হাড়, মাটি না খুঁড়েই, পাওয়া গেছে। ছবিতে বিরাট আকারের গণ্ডার জাতীয় জন্তুর ফসিল দেখা যাচ্ছে।
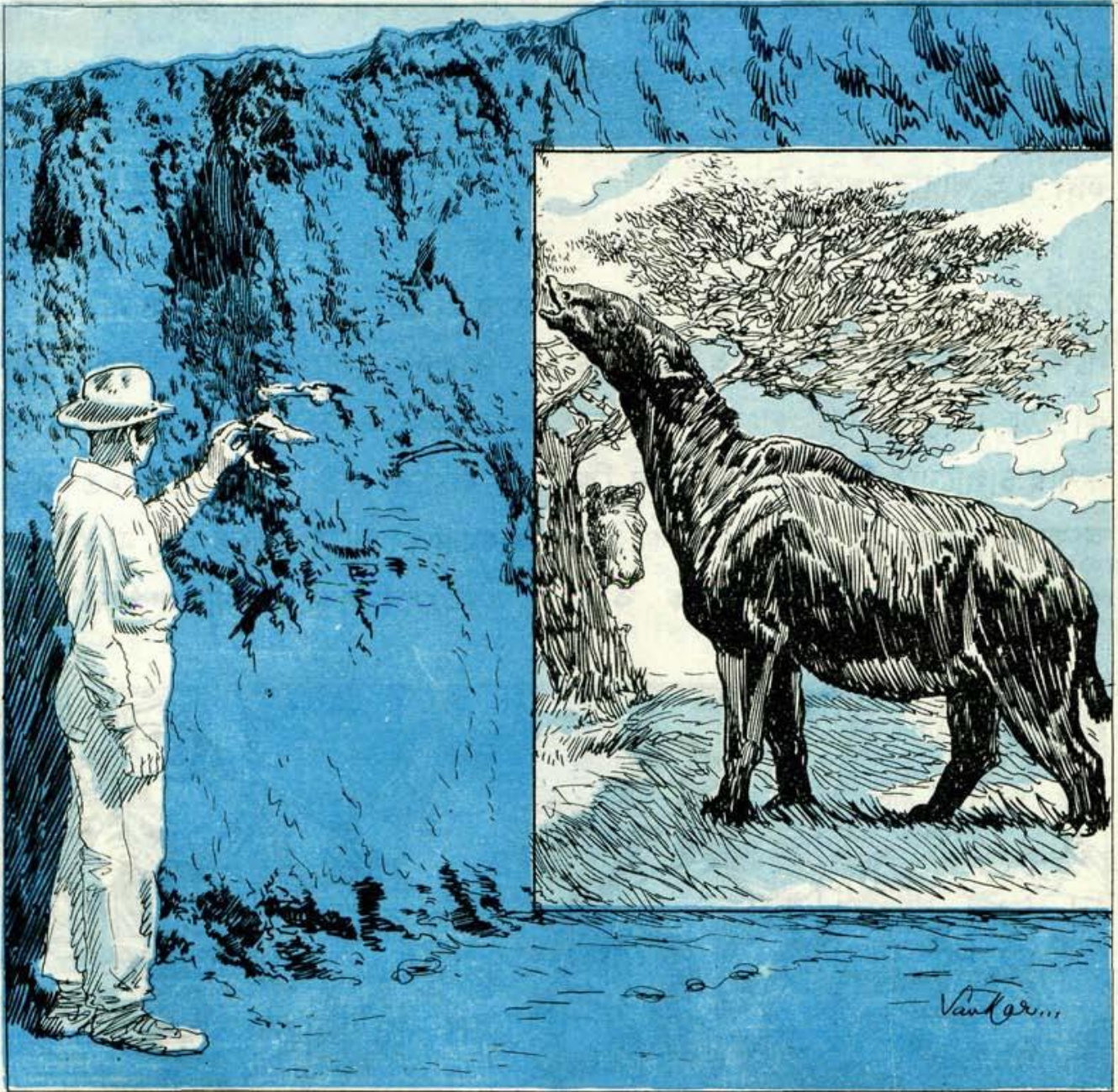
মায়া সরোবর

বার

[অশ্বারোহীদের মাধ্যমে মন্ত্রী ধর্মমিত্র জানতে পারল জয়শীল কোথায় আছে। জয়শীল মকরকেতুকে নিয়ে মন্ত্রীর কাছে গেল। মকরকেতু জানত তাকে মেরে ফেলবে। তাই সে জলগ্রহকে জল খাওয়ানোর নাম করে পুকুরে নামল। জলগ্রহের পিঠে মকরকেতুর পেছনে জয়শীল ও সিদ্ধসাধক ছিল। হঠাৎ জলগ্রহ সবাইকে নিয়ে জলে ডুবে গেল। তারপর......]

জলগ্রহ হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ায় জয়শীল ও সিদ্ধসাধক জল থেকে উঠে আসতে পারল না। দুজনে বুঝল জলে ডুবেই তাদের মরে যেতে হবে। সিদ্ধসাধক আর বাঁচার উপায় নেই ভেবে তার দেবীকে স্মরণ করল, "জয় মহাকাল!"

জয়শীল এই ডাক শুনতে পেয়ে এদিক ওদিক তাকাল। তার সামনেটা মকরকেতু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। তার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। গভীর জলে নেমেও সিদ্ধসাধকের গলা সে শুনতে পেল। সামনে সে মকরকেতুকে দেখতে পাচ্ছিল। এসব দেখে জয়শীল অবাক না হয়ে পারল না।

জয়শীল স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যেন

হঠাৎ মকরকেতুর কাঁধে হাত দিয়ে গর্জে উঠল, "ওরে এই দুরাত্মা, কি করছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমরা অনেক আগেই তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু মারিনি। প্রতিদনে তুমি আমাদের জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছ?"

এই প্রশ্ন শুনে মকরকেতু হো হো করে হেসে বলল, "জয়শীল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তালগাছ প্রমাণ গভীর জলে আমরা এখন আছি। কোন মানুষ এত গভীর জলে ডুবে দেখতে পায়, কথা বলে? শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে? বাঁচতে পারে?"

"সত্যি জয়শীল, এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে, এসব মহাকালের দয়া।" বলে সিদ্ধসাধক চারদিকে তাকাল।

ঐ পাহাড়ী পুকুরের গভীরে নানা ধরণের প্রাণী সাঁতার কেটে ওদের আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বড় বড় মাছ, কুমীর, সাপ—আরও যে কত রকমের প্রাণী ছিল তা বলার নয়। জলগ্রহ মাঝে মাঝে শুঁড় তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেখান থেকে ওরা ঢুকল একটা পাহাড়ী গুহায়। ঝর্ণার জল বেরিয়ে আসছিল ঐ গুহা থেকে।

মকরকেতু হুকুম দেওয়ায় মত বলল, "জলগ্রহ!"

"জয়শীল, সিদ্ধসাধক, কথা বলছ না কেন? কি ভাবছ? এত গভীর জলে ঢুকেও কিভাবে বেঁচে আছো তাই ভাবছ? বুঝতে পারছ কিভাবে কি হচ্ছে?" মকরকেতু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

জয়শীল শক্ত হাতে তরবারি ধরে বলল, "বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর তোমার জলগ্রহকে যতক্ষণ ছুঁয়ে আছি ততক্ষণ আমাদের গায়ে জল লাগবে না,

আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারব।"

"আস্তে আস্তে সবই বুঝতে পারবে জয়শীল। অত শক্ত হাতে তরবারি ধরে আছ কেন?" মকরকেতু বলল।

তোমার মুণ্ডু কাটার জন্যে। তুমি জলগ্রহকে নিয়ে উপরে উঠবে কিনা জানতে চাই?" জয়শীল বলল।

সিদ্ধসাধক হাতের ত্রিশূল উপরে তুলে জোরে জোরে বলল, "জয় মহাকাল! জলের তলায় বলি দেওয়া নিষেধ। ধৈর্য ধর জয়শীল। এইবার দেখ কি হয়।" বলে ত্রিশূলটা মকরকেতুর গর্দানের উপর রেখে চাপ দিল।

মকরকেতু হাসতে গিয়ে হাসতে পারল না। ত্রিশূলের চাপ লাগছিল। হাত দিয়ে সেটা সরাতে সরাতে সে বলল, "মহাবীরের আর মহাকালের ভক্তের— দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। শুনে রাখ, আমি আর এই জলগ্রহকে নিয়ে জলের উপরে উঠছি না। আর তোমাদের হাতে বন্দী হতেও যাচ্ছি না। আর এও শুনে রাখ, তোমরা যে মুহূর্তে আমাকে মেরে ফেলবে সেই মুহূর্তেই তোমাদেরও মৃত্যু হবে। এত গভীর জল থেকে উপরে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের কোনক্রমেই থাকবে

এমন সময় একটা কুমীর বিরাট বড় মাছকে তাড়া করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। জয়শীল তরবারি তুলে কুমীরটাকে মারতে গেল। তখন মকর-কেতু কুমীরের লেজ ধরে কয়েকবার পাক দিয়ে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে বলল, "জয়শীল তোমরা দুজনে আমার বন্দী নও। আমিও এখন তোমাদের হাতে বন্দী নই। জলগ্রহ এখন যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সে জায়গায় পৌঁছে গেলে তোমরা তোমাদের পথে যেতে পারবে।"
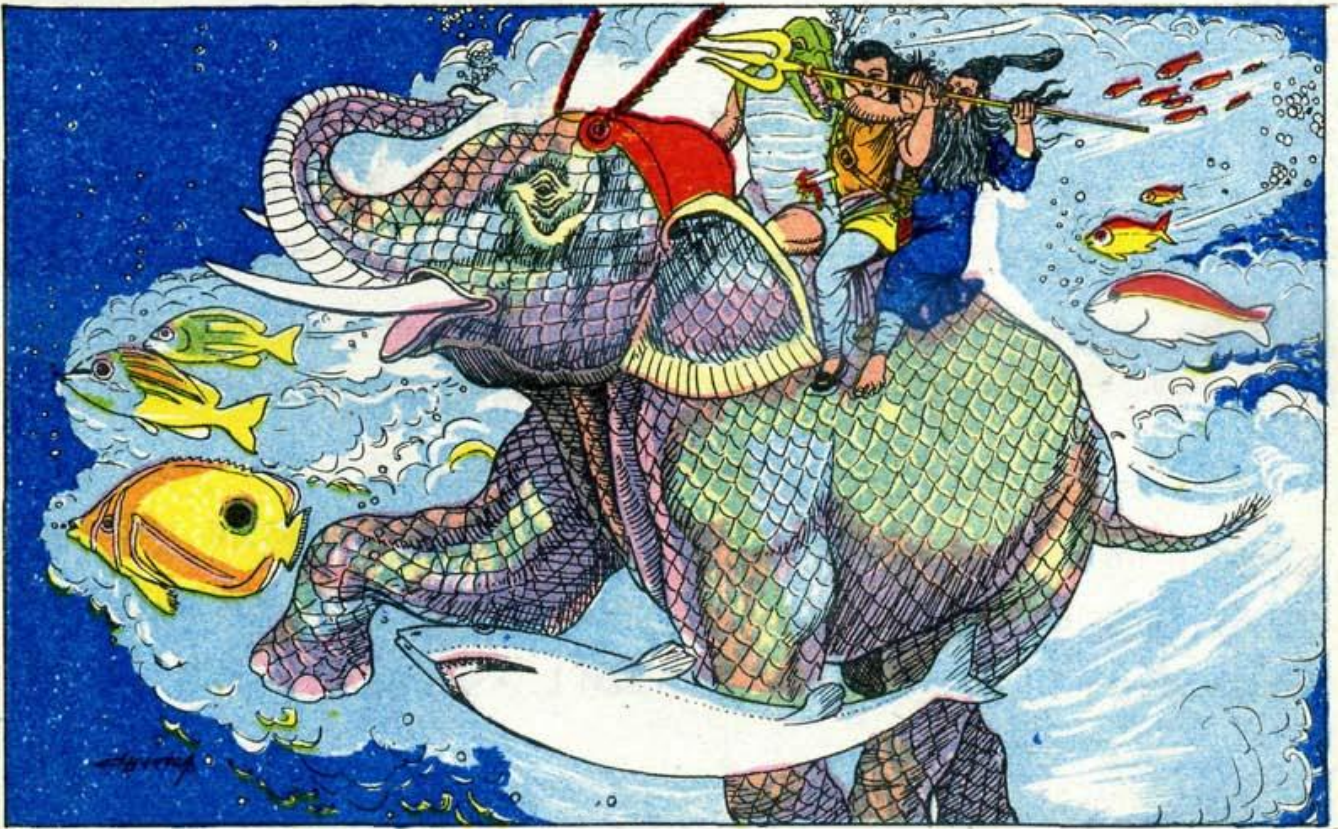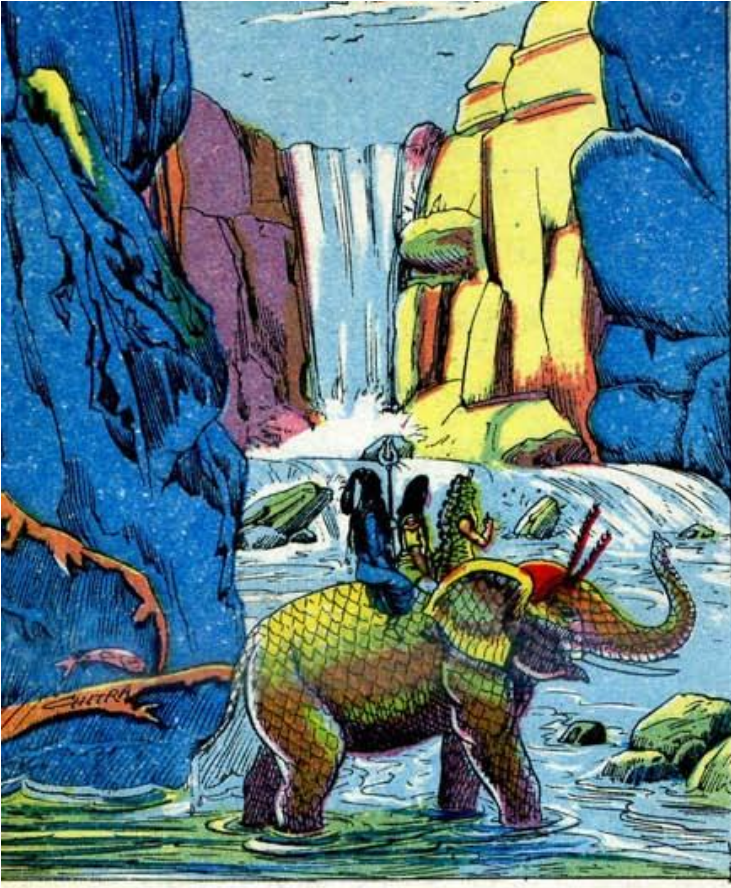
না। হয়ত ভেসে উঠবে তবে জ্যান্ত অবস্থায় নয়।"

জয়শীল ও সিদ্ধসাধক ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে ওরাই এখন মকর-কেতুর হাতে বন্দী। ওদের ভয় করল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। জলগ্রহ ঐ গভীর জলেও অবলীলাক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিল।

"মকরকেতু, তাহলে তুমি আমাদের দুজনকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ শুনি?" জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

মকরকেতুর কথা শেষ হতে না হতেই জলগ্রহ একটি গুহায় ঢুকল। ঘন অন্ধকার গুহা। জয়শীল মকরকেতুকে শক্ত হাতে ধরে রইল। কারণ ঐ অন্ধকারে একবার গড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। সিদ্ধসাধক ডাকতে লাগল, "জয় মহা-কাল! বিপদ থেকে তুমিই একমাত্র রক্ষা করতে পার।" তারপর সে জয়শীলের কোমর শক্ত হাতে ধরল।

কিছুক্ষণ পরেই জলগ্রহ সেই গুহা থেকে বেরিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। মকরকেতুর নির্দেশে জলগ্রহ

সশব্দে ডাক ছাড়ল।

এতক্ষণ পরে জল থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দে জয়শীল ও সিদ্ধসাধক টেনে শ্বাসপ্রশ্বাস নিল। তারপর যে জায়-গায় ওরা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে চারদিকে তাকাল। চারদিকেই পাহাড় ছিল। মাঝখানে নিচের দিকে জল ছিল। পাহাড়ের ভেতর থেকে, গুহা থেকে জল আসছিল। অন্য গুহা দিয়ে জল সশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এসব দেখে জয়শীলের মনে পড়ল আগের ঘটনা। জলে ডোবার আগে মাঝে মাঝে জয়শীল "মায়া সরোবরেশ্বর" বলে চিৎকার করত। সে সরোবরেশ্বরকে স্মরণ করত। এটাই হয়ত সেই সরোবর। জয়শীল মনোযোগ সহকারে চারদিকের সব কিছু দেখছিল।

মনের প্রশ্ন মনে না রেখে সে মকর-কেতুকে জিজ্ঞেস করল। মকরকেতু তাকে বলল, "জয়শীল, তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। আমাদের রাজা সরোবরেশ্বর যে সরোবরে থাকবে এটা সেটা নয়। যে মানুষ ঐ জায়গাটা দেখেছে সে আর ফিরে যেতে চায়নি।"
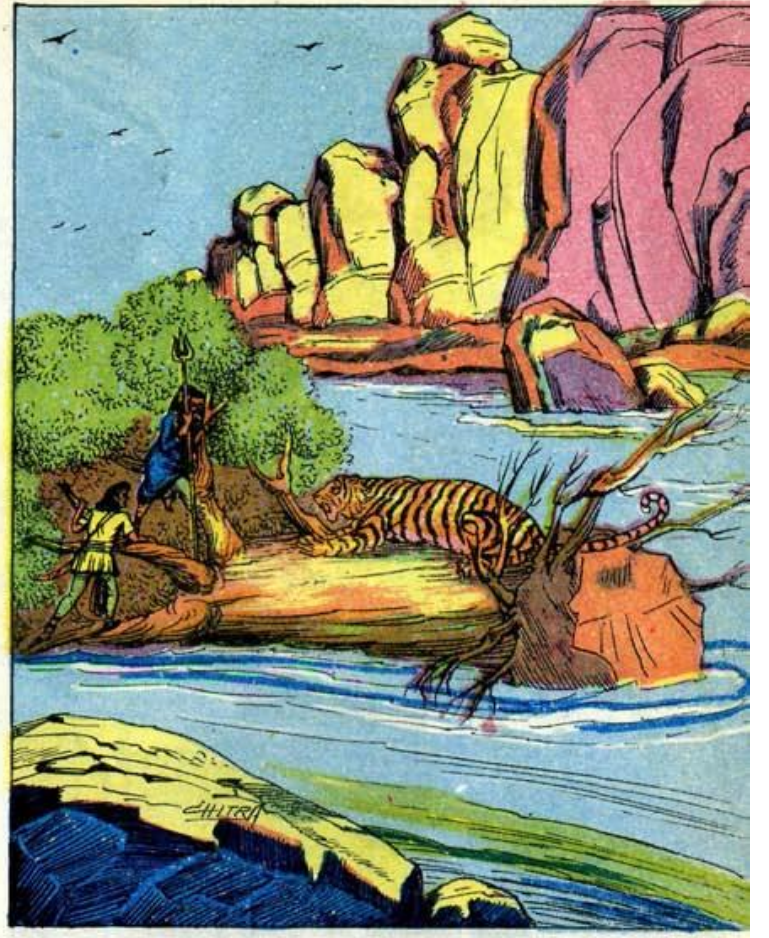
"তাহলে কি আমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছ?" জয়শীল জিজ্ঞেস করল।

মকরকেতু মাথা নেড়ে জানালো যে সেখানেই সে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সিদ্ধ-সাধক পেছন থেকে ত্রিশূল দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেই মকরকেতু নির্ভয়ে বলল, "তোমরা দুজনেই বড্ড তাড়াহুড়ো কর। অহেতুক আমাকে ধরে তোমরা এই বিপদে পড়লে। আমার পেটে তরবারি ঢুকে রয়েছে দেখেও বের করতে দিলে না। উপরন্তু কাঁধে তীর বেঁধালে। তোমরা কি সাঁতার জান? না
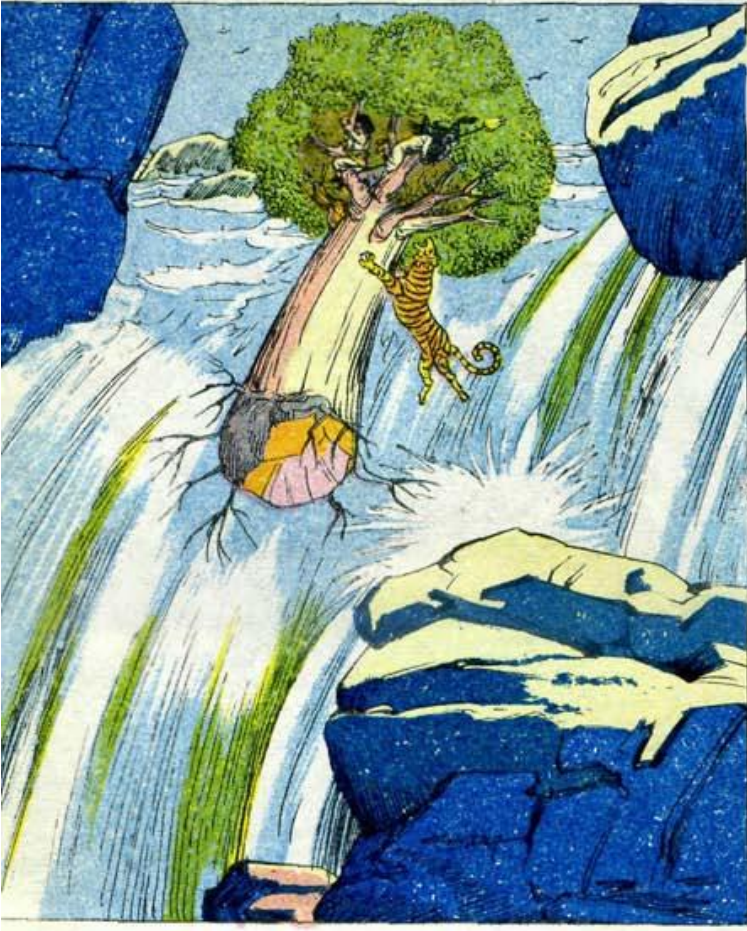
জানলে, জলে ভেসে আসা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাও।" বলে সে জোরে জোরে বলল, "জলগ্রহ এগিয়ে চল।"

জয়শীল বুঝতে পারল বিরাট একটা বিপদে তারা পড়ে যাবে। তাই জলগ্রহ জলে ডোবার আগেই সিদ্ধসাধককে ইশারা করে জলে ঝাঁপ দিল। কিছুক্ষণ পরে ওরা বিশাল গাছ ধরল। গাছ বেয়ে একটু উঠতেই সামনে দেখতে পেল একটি বাঘ।

একই সঙ্গে ওরা বাঘকে আর বাঘ ওদের দেখতে পেল। একবার ডেকে সামনের দুটো পা তুলে বাঘ সিদ্ধসাধকের দিকে তাকাল। সাধক ত্রিশূল তুলতেই জয়শীল তাকে বলল, "সাধক, খুব সাবধান! এমনও হতে পারে যে বাঘও আমাদেরই মতন জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠার চেষ্টা করছে। ত্রিশূল দেখেই হয়ত সে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবছে। সে হয়ত তোমাকে ভয় পাচ্ছে। তোমার আর বাঘের লাফালাফিতে এই গাছ জলে ডুবে যেতে পারে।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু বাঘটা যেভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পা তুলে আছে তা দেখে আমি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি?" বলে এক দৃষ্টিতে বাঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই সাধক বলল, "জয়শীল, আমি মুখ ঘোরালেই বাঘ হয়ত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই গাছটা ভাসতে ভাসতে কোথায় যে যাবে বুঝতে পারছি না।"

একটু ভয় পেয়ে জয়শীল বলল, "আমিও বুঝতে পারছি না সাধক। তবে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই অঘটন ঘটে যাবে।"

সিদ্ধসাধক ভয়ে কাঠ হয়ে বলল, "এই গাছটা ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?"

"খবরদার, গাছ ছেড়ো না। আর বাঘের দিকে যেভাবে তাকিয়ে আছ সেভাবেই থাক।" জয়শীল বলল।

পরক্ষণেই বাঘ গর্জন করে উঠল। সিদ্ধসাধকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। পর মুহূর্তেই জলপ্রপাতের মুখে পড়ে গাছটা দু-তিনশো গজ নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

জয়শীল ও সাধক ঐ গাছ ধরে জলপ্রপাতের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে নিচের দিকে পড়তে পড়তে, পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে ওরা জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো কাটিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে গাছটা যেখানে পড়ল সেখানে অনেকগুলো বড় বড় পাথর ছিল। নিচে পড়ে গাছটা দু-ভাগ হয়ে গেল। একটা ভাগে রইল জয়শীল অন্য ভাগে রইল সিদ্ধসাধক ও বাঘ। জলপ্রপাতের সঙ্গে নিচে পড়ার কিছুক্ষণ পরে জয়শীল চোখ খুলে তাকাল। দেখতে পেল এক কোমর জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে জলপ্রপাতের গর্জন শুনছিল।

"তাহলে আমি বেঁচে আছি ! হাত-পা আছে না ভেঙ্গে গেছে!" বলতে বলতে সে নিজের শরীরটাকে দেখল। হাত-পা
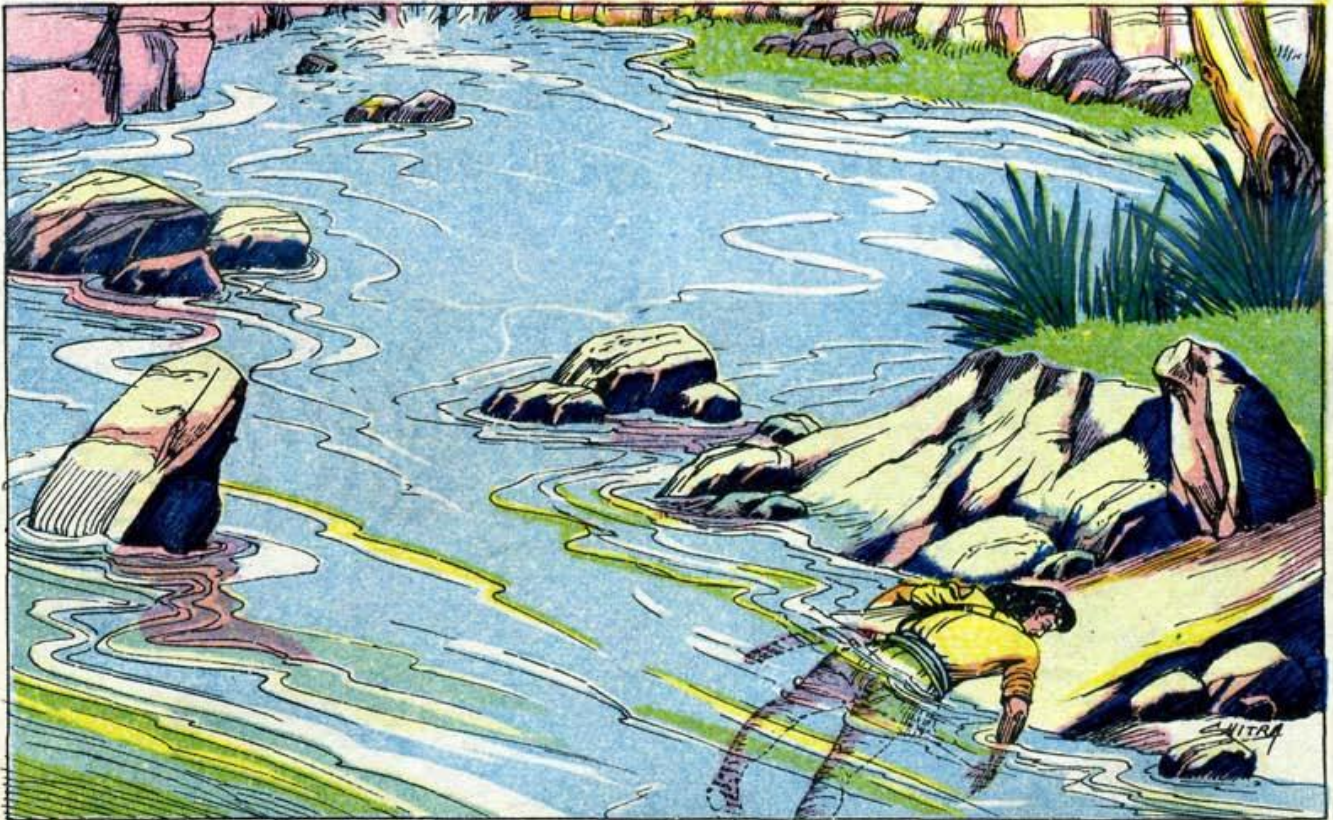
নাড়ল। ডান হাতে খুব ব্যথা। দুটো পা-ই ব্যথা করছিল। নিচের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে সে আবার বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার! আমার হাত-পা সব আছে! আমি বেঁচে আছি!" কয়েক জায়গায় চোট লেগেছে। হঠাৎ মাথা তুলে বলল, "তাই তো, সাধক কোথায়!"

আশেপাশে বড় বড় পাথর ছড়িয়ে-ছিল। গাছের যে অংশে সে ছিল সেই অংশটা ঐ পাথরের আড়ালে পড়েছিল। সে সাধককে দেখতে পেল না।

"সাধক কোথায় গেল! সে কি আর নেই! কোন বড় পাথরের উপর পড়েই হয়ত সে মারা গেছে! "বলতে বলতে জয়শীল চারদিকে তাকাতে লাগল। সিদ্ধসাধককে দেখতে না পেয়ে তার মনে কষ্ট হচ্ছিল। এর আগে কত বিপদে আপদে একসঙ্গে কাটিয়েছে। "এতক্ষণে হয়ত সাধকের মৃতদেহ কুমীরের পেটে চলে গেছে। এখন কি করি? শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কি আমাকেই করতে হবে?" জয়শীল আপন মনে বলল।

সেখান থেকে এক পা এক পা করে পথ করতে করতে সে বেরোতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর জয়শীল শুনতে পেল বাঘের গর্জন। আর তখনি তার মনে পড়ল ঐ বাঘের কথা।

"সাধক হয়ত বাঘের পেটে চলে গেছে।" বলে তরবারি বের করে যেদিক থেকে বাঘের গর্জন আসছিল সেদিকে সে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর জয়শীল দেখতে পেল একজায়গায় সাধক কাঠ হয়ে পড়ে আছে। মনে হল, বাঘ পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। জয়শীল দেখতে পেল বাঘ সাধকের দিকে এগোচ্ছে। (আরও আছে)

নকল সুধীর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে তিনি যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার আশা পূরণ না হওয়ার কারণ হিসেবে তুমি হয়ত ভাবছ তোমার অলৌকিক শক্তি নেই। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। মৈত্রেয়ের কাহিনী শুনলে আমি যা বলতে চাইছি তা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার এই কাহিনী শুনলে পথচলার পরিশ্রমও লাঘব হবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করে দিল:

উজ্জয়িনী নগরের রাজা ছিলেন সুধীর। তাঁর প্রাসাদে বীরদাস নামে এক

বেতাল কথা

নামকরা শিল্পী ছিল। মৈত্রেয় নামে তার এক ভাই ছিল। মৈত্রেয় হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে বহু সিদ্ধ-পুরুষকে সেবা করে এক অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল। সেই শক্তি হল শিল্পে প্রাণ সঞ্চার।

মৈত্রেয় তার অলৌকিক শক্তি রাজাকে দেখাতে চাইল। তার দাদাকে দুটো নারীমূর্তি তৈরি করতে বলল। ভরা রাজসভায় সে ঐ দুটি নারীমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করল। তা দেখে রাজা এবং অন্যান্য সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

মহারাজ সুধীর, তারপর মৈত্রেয়কে তাঁর প্রাসাদে থাকতে অনুরোধ করলেন। মৈত্রেয় রাজার অনুরোধে প্রাসাদে থেকে গেলেন। কিছুকালের মধ্যে সুধীর ও মৈত্রেয়র মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল। একবার সুধীরের ইচ্ছে করল নিজের বিকল্প রূপ ও আকৃতি দেখার। মনের এই ইচ্ছা রাজা সুধীর মৈত্রেয়ের কাছে প্রকাশ করলেন। মৈত্রেয় তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে রাজী হল।

মৈত্রেয় রাত্রে তার দাদা বীরদাসকে রাজা সুধীরের মূর্তি তৈরি করতে বলল। বীরদাস পাথর দিয়ে সুধীরের মূর্তি তৈরি করল। মধ্যরাত্রে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নকল সুধীরকে নিয়ে মৈত্রেয় রাজভবনের দিকে গেল।

অন্য দেশের রাজধানীর মতই উজ্জয়িনীতেও শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ছিল। ওরা অতর্কিতে নকল সুধীরকে আক্রমণ করে, মেরে ফেলে পালিয়ে গেল। সকাল হতে না হতেই চারদিকে রাজার মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর মুখেমুখে আবার প্রচারিত হল যে আসল রাজার মৃত্যু হয়নি, নকল

রাজার হয়েছে। এই খবর শুনে প্রজাদের উদ্বেগ কমে গেল। কিন্তু দেশে দুষ্ট শক্তিগুলো ব্যাপারটাকে ঐখানেই শেষ করল না। ওরা সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা প্রচার করল। ওদের প্রচার ছিল, "আসল রাজাই মারা গেছে। এখন যে রাজা আছে সেই রাজা মৈত্রেয়ের তৈরি নকল রাজা। রাতারাতি হঠাৎ শত্রুর হাতে রাজা নিহত হওয়ায় মৈত্রেয় তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে নকল রাজা তৈরি করল।"

এই প্রচার যারা শুনল তারা সহজে তা অস্বীকার করতে পারল না। কারণ ওরা জানত রাজা সুধীরের সঙ্গে মৈত্রেয়ের সম্পর্ক গভীর ছিল।

শুধু যে প্রজাদের মধ্যেই এই প্রচার ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, অন্তঃপুরের দাস-দাসী এমন কি রাণীর মনেও এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সকলেরই মনে সন্দেহ ঢুকেছিল।

স্বভাবতঃই, এই অবস্থা রাজা সুধীরের মনে ব্যথা দিয়েছিল। কিভাবে যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তখন তিনি
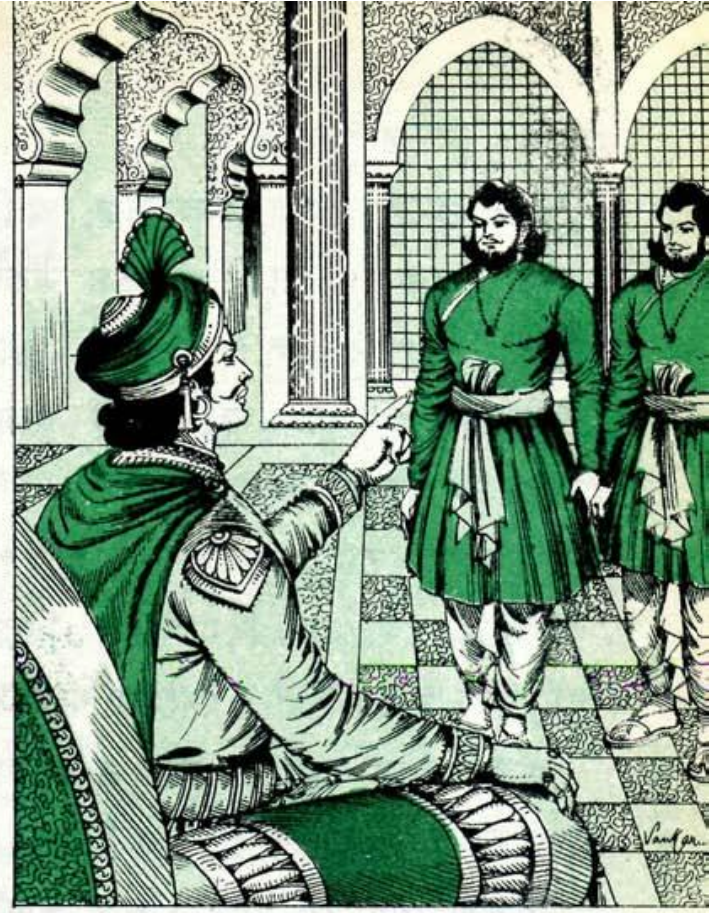
মৈত্রেয়কে এই সমস্যার সমাধান করতে বললেন। ইতিমধ্যেই মৈত্রেয় এই সমস্যা নিয়ে ভাবছিল। তার সামনে একটি মাত্র উপায় ছিল।

মৈত্রেয় সেদিন রাত্রে তার নিজের চেহারার মত একটি মূর্তি গড়তে তার দাদাকে বলল। শিল্পী বীরদাস মৈত্রেয়ের মূর্তি তৈরি করল। সেই মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে এক রাত্রে মৈত্রেয় গোপনে রাজার সামনে গিয়ে হাজির হল। রাজা সুধীর দুই মৈত্রেয়কে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে যে আসল

মৈত্রেয় বুঝতে পারছি না।"

তখন মৈত্রেয় বলল, "মহারাজ, আমি আসল মৈত্রেয়। আর এটি হল নকল মৈত্রেয়। আপনি কাল প্রকাশ্য রাজসভায় দেশদ্রোহী ঘোষণা করে এই নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিন।"

"তারপর তোমার অবস্থা কি হবে?"

"আমি গোপনে হিমালয়ের দিকে পাড়ি দেব মহারাজ।" মৈত্রেয় বলল।

পরের দিন সকালে ভরা রাজসভায় রাজা নকল মৈত্রেয়কে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে আবার বলল, "রাজা, মৈত্রেয় যে সমাধান বের করল সেটা যে সঠিক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অত কষ্ট করে যে অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিল সেই অলৌকিক শক্তি পেয়েও বেচারাকে হিমালয়ে ফিরে যেতে হল কেন? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "অলৌকিক শক্তি ব্যবহারিক জীবনে কতটা যে কাজ দেয় তা কেউ বলতে পারে না। আসলে ঐসব শক্তির উপর মানুষের ক্ষমতা থাকে না। যে মৈত্রেয় অতবড় অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিল তার পক্ষে আর চারজনের মত ঘোরাফেরা করা সম্ভব নয়। সেটা সে টের পেয়েছিল দেরিতে। টের পেয়েই সে আর রাজধানীতে থাকতে পারলনা।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
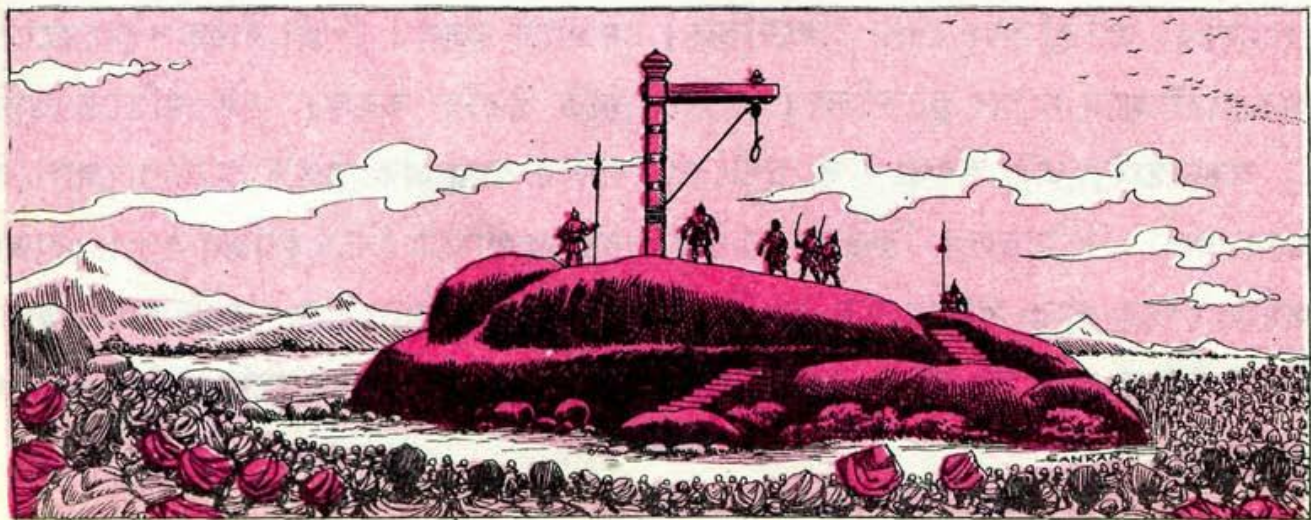
প্রিয়তম

ইন্দ্রদেশের রাজা ছিলেন চন্দ্রসেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন শিবশর্মা। বছরে একবার পূজোর সময় টানা কয়েকদিন উৎসব হত। নানা স্থান থেকে কবি, গাইয়ে এসে ঐ উৎসবে যোগদান করত। ওরা রাজার কাছে পুরস্কার পেত। সে বছর শিবশর্মাও রাজার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছিল।

পুরস্কার পাওয়ার পর ঐ ব্রাহ্মণ কবি শিবশর্মা যেখানে ব্রাহ্মণদের থাকার ও খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল সেখানে গেল। সেই জায়গাটা পরিষ্কার ছিল না। কর্দমাক্ত ছিল। সেখানে ঘোরাঘুরি করার সময় শিবশর্মা পা হড়কে পড়ে গেল। তার কাপড়-চোপড়ে কাদা লেগে গেল।

প্রাসাদের উপর থেকে রাজা শিবশর্মাকে কর্দমাক্ত অবস্থায় দেখে তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "একি হল কবি ?"

"ক্ষুত্তৃ ডাশাঃ কুটুম্বিন্যো ময়ি জীবীতি নান্যগাঃ,
তাসা মন্ত্যা প্রিয়তমা, তস্যা শৃঙ্গার চেষ্টিতম্।"

[আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আশা নামে তিনটি স্ত্রী আছে। এই তিনজনের মধ্যে তৃতীয়জন আমার প্রিয়তমা। আমাকে সে-ই এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে।]
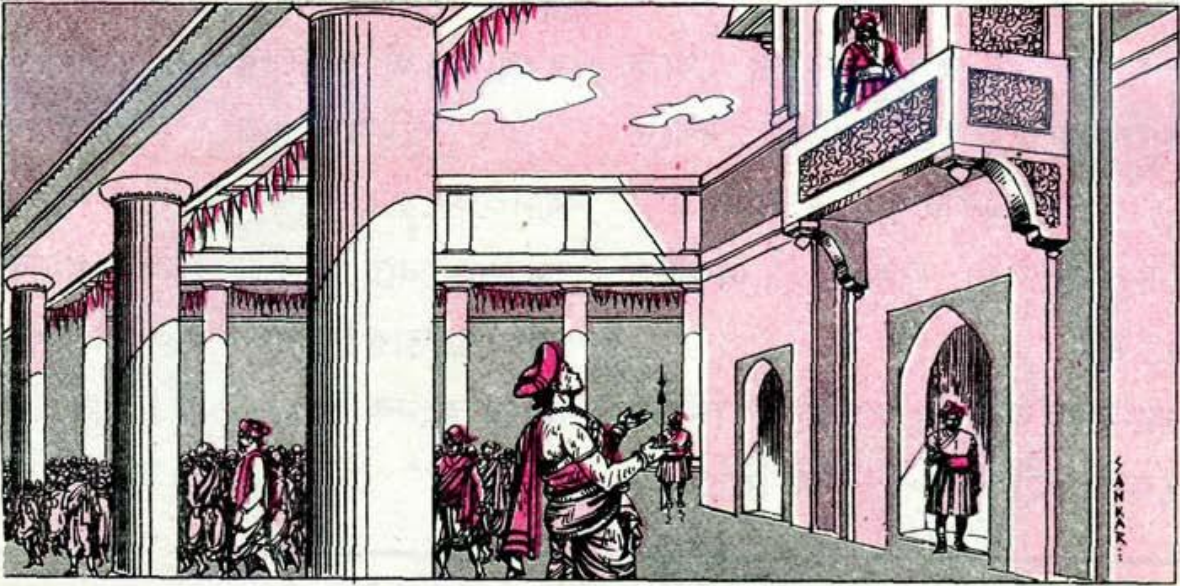
মুরগী পালন

গীতাপুরের ডিম নামকরা ডিম। ঐ গ্রামের চাষীরা মুরগী পালন করত। যে কোন বাজারে ঐ গ্রামের ডিমের কদর ছিল। ডিমগুলো ছিল বড় বড়। খেতেও ছিল সুস্বাদু। ফলে ঐ গ্রামের ডিম প্রচুর বিক্রি হত। তাই গ্রামের চাষীদের যারা মুরগী পালন করত, অনেক টাকা-পয়সা রোজগার হত!

হঠাৎ কি যে হল, একধার থেকে মুরগীগুলো মরে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে গ্রামের একটি মুরগীও বাঁচল না। দীননাথের পাঁচশো মুরগী ছিল, একটিও বাঁচলো না।

"মুরগীদের বাতাস লেগেছে। নিশ্চয় এটা কোন ভূতের কাণ্ড। ওঝা দিয়ে ভূত না তাড়ালে এই গ্রামে আর মুরগী বাঁচবে না। আমাদের মুরগী যদি মারা যায় তাহলে আমরা বাঁচবো কি করে?" গ্রামের চাষীদের কাছে দীননাথ বলল।

তার কথা অন্য চাষীদের মনে ধরল। পাশের গ্রামে ছিল এক ওঝা। সবাই চাঁদা তুলে ঐ ওঝাকে আনল। গীতাপুরের ভূতগুলোকে তাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হল ঐ ওঝাদের।

এক শনিবার ওঝা, শিষ্যসহ এসে, অনেকক্ষণ ধরে পূজোপাঠ, লম্ফঝম্ফ করে ভূত তাড়ানোর পর্ব শেষ করল। গ্রামবাসী ওঝা এবং তার শিষ্যদের ভাল ভাল খাবার খাইয়ে অনেক টাকা দিয়ে বিদায় দিল। টাকা নিয়ে খুশী মনে ওঝা ফিরে গেল।

এ. সি. সরকার (যাদুসম্রাট)

ভয় কেটে গেছে ভেবে গীতাপুরের চাষীরা আবার মুরগী কিনল। মুরগীগুলো ডিম পারল। ডিম বিক্রিও হল। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার সমস্ত মুরগী আগের মত মরে গেল।

"না আর মুরগী পালন করে লাভ নেই। আমাদের আবার ক্ষেতে খামারে চাষ করতে হবে। একবার যখন অভিশাপ লেগেছে আর তা মুছে যাবে না।" দীন-নাথ চাষীদের বলল।

ফলে ক্ষেতে খামারে চাষের সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে গীতাপুরের চাষীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হল।

গীতাপুরের এক জমিদারের ছেলের নাম ছিল শঙ্কর। ছুটি পড়লে সে শহর থেকে বাড়িতে আসত। আগের বারের ছুটিতে সে বাড়িতে এসে, প্রত্যেকদিন ছুবেলা ডিম দিয়ে ভাত খেয়েছিলো। এবারে টানা তিনদিন খাওয়ার পাতে ডিম না পেয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগল।

মাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করল শঙ্কর। মার মুখে শুনল যে, অভিশাপের ফলে মুরগীগুলো মরে যাচ্ছে। শঙ্কর জানত, ঐ গ্রামের চাষীরা মুরগী পালন করে কি পরিমাণ রোজগার করে। চাষীদের এত বড় রোজগারের পথ বন্ধ হওয়ায় শঙ্কর

বাঁচাতে হলে চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু শঙ্করের কথায় তেমন কাজ হল না। চাষীর মনে যে কথা গেঁথে যায় তা সরানো অত সহজ নয়।

শহরে থাকতে থাকতে শঙ্কর নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিল। এক যাদুকরের কাছে সে কিছু যাদুও শিখেছিল। সে ঠিক করল যাদুর সাহায্যে এই জটিল সমস্যার সমাধান করবে।

শঙ্কর ঐ চাষীদের বলল, "শহরে থাকার সময় বাবার চিঠিতেই আমি এখানকার মুরগী মরে যাওয়ার খবর পেয়েছিলাম। তোমরা জান, শহরে অনেক মন্দির আছে, বহু গুণী লোক সেখানে থাকে। আমি এক সাধুর সঙ্গে দেখা করে আমাদের গ্রামে মুরগীগুলোর মরে যাওয়ার ব্যাপার জানালাম। সাধু দয়া করে আমার সব কথা কান পেতে শুনলেন। তাঁর নাম, হয়ত আপনারা শুনেছেন, গম্ভীরানন্দ মহারাজ। তিনি একটি কবচ আমার হাতে দিয়ে বললেন, এর প্রভাবেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ডিমের উপর এই কবজের নাকি অদ্ভুত প্রভাব পড়ে।

উদ্বিগ্ন হল। দেশে মাছের দাম দিনকে দিন বাড়ছে। মাংসর দাম, আজ অনেক বছর চড়া দরে বাঁধা আছে। এই অবস্থায় অনেক পরিবারে ডিম চলত। মুরগী পালন বন্ধ হয়ে গেলে শুধু যে চাষীদের রোজগার কমে যাবে তাই নয়, সাধারণ লোকেরও অসুবিধা হবে।

পরেরদিন সকালে শঙ্কর দীননাথের বাড়ীতে গেল। বার বার শঙ্কর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে মুরগা মারা যাওয়ার কারণ অভিশাপ নয়, রোগ। এই রোগের হাত থেকে মুরগাগুলোকে

তোমরা যদি দেখতে চাও আমি তোমাদের সামনেই কতখানি প্রভাব পড়ে তা পরীক্ষা করে দেখাতে পারি। তোমরা যখন দেখতে চাইবে আমি তখনই দেখাতে রাজী আছি। ডিমের উপর ঐ কবচের প্রভাব যদি সত্যই পড়ে তাহলে আমরা বুঝতে পারব অভিশাপ কেটে গেছে।"

"কালকেই দেখা যাক না। আমাদের এখানেই দেখান। আরও যারা আসেনি তাদের ডেকে পাঠাব।" দীননাথ বলল।

পরের দিন বিকেলে শঙ্কর দীননাথের বাড়িতে গেল। গাঁয়ের সব ধনী চাষী সেখানে উপস্থিত ছিল। শঙ্কর একটা তামার কবচ সকলের সামনে রাখল। পকেটথেকে রুমাল বের করল। বাঁহাতের তালুতে ঐ রুমাল পেতে ডান দিকের পকেট থেকে ডান হাত দিয়ে একটি ডিম বের করে বাঁহাতের উপর রাখল। তার-পর সেই ডিমটাকে রুমাল দিয়ে ঢেকে দিল। ঐ কবচ তুলে নিয়ে রুমালের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ ঠোঁট নেড়ে যাদুর মন্ত্র পড়ে বলল, "হিম্ ট্রিম্ রিম্, ফোটরে ওরে ডিম।" তারপর কিছুক্ষণ রুমালটা আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করে সেটা তুলে ফেলল। দেখা গেল শঙ্করের ডানহাতে দুটো ডিম আছে।
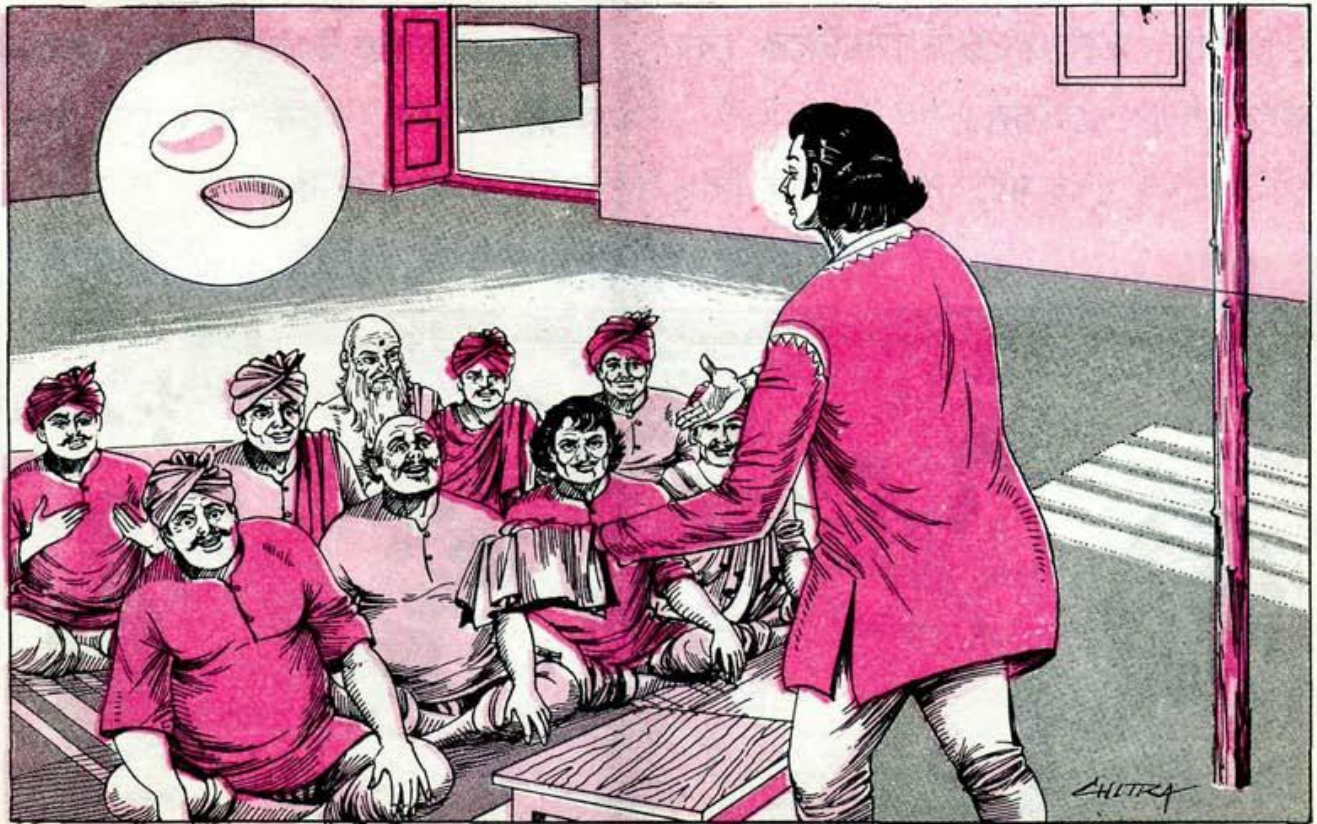
চাষীরা ঐ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল।

শঙ্কর ঐ ডিম দুটোকে রুমালে জড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরে সকলের সামনে কবচ-টিকে লাল সুতো দিয়ে হাতে বেঁধে নিল।

পরেরদিন সে শহরে গিয়ে মুরগী পালনের ব্যাপারে নিযুক্ত সরকারী চিকিৎসকের কাছে সবকিছু শিখে নিল।

সেদিন চাষীদের শঙ্কর যে ডিম দেখি-য়েছিল আসলে ঐ দুটো ডিমের মধ্যে একটি ছিল ডিমের খোলস। একটি বড় ডিমের খোলসের একটু ভেঙ্গে তার ভিতরে ছোট ডিম ঢোকানো ছিল। রুমালের উপরে ভাঙ্গা দিকটা রাখা ছিল। তাই চাষীরা বুঝতে পারেনি। পরে খোলসের ভেতরের ছোট ডিমটাকে বের করে সে দেখিয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়, শঙ্কর নিজে কিছু মুরগী কিনে পালন করতে লাগল। চাষী-দের নজর এড়িয়ে সে মুরগীদের ওষুধ খাওয়াত ইন্‌জেকশন্ দিত। কয়েকদিনের মধ্যে শঙ্করের মুরগীগুলো ডিম পাড়ল। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চাষীদের বিশ্বাস হল যে শঙ্করের ঐ কবচের ক্ষমতা অসীম।

"আমি আর কি করেছি দীনুমামা। সব এই কবচের ফলেই হল। মুরগীগুলো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর দিয়েছি। তোমরা নির্ভয়ে আবার মুরগী কিনতে পার। এই কবচ যতদিন আছে ততদিন যারা মুরগী পালন করবে তাদের প্রত্যেকের বাড়ি আমি একবার ঘুরে আসব।" শঙ্কর বলল।

শঙ্করের কাছে উৎসাহ পেয়ে গ্রামের চাষীরা আবার নতুন উদ্যোগে মুরগী পোষার কাজ শুরু করল।
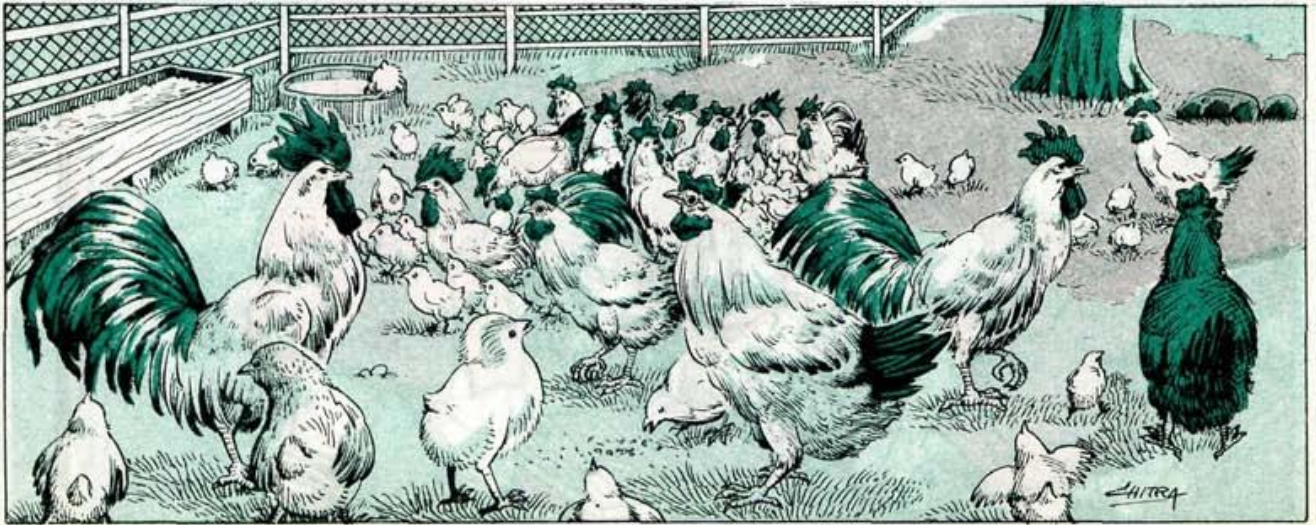
টিকে থাকার কৌশল

চন্দ্রবর্মার রাজসভার প্রহরীর নাম ছিল ধর্মরাজ। একবার চন্দ্রবর্মা ধর্মরাজকে বলেছিলেন, "তুমি একা রাজসভা পাহারা দাও। এতে তোমার হয়তো কষ্ট হয়। তাই, ভাবছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আর একজনকে রাখব।"

"আজ্ঞে, আর একজনকে রাখার কি দরকার......" ধর্মরাজের মুখের কথা মুখেই রইল। রাজা চন্দ্রবর্মা সেখান থেকে চলে গেলেন।

ধর্মরাজ সঙ্গে আর কাউকে নিতে চায়নি। তার এই কথা বলার পেছনে কারণ ছিল। রাজার কাছে যারা আসত সে তাদের কাছে ঘুষ নিত। যারা টাকা পয়সা দিতে পারত না সে তাদের কাছে কলাটা মূলোটা নিত। তার সঙ্গে আর একজন কাজ করতে এলে দু রকমের বিপদ আছে। ঘুষে সে ভাগ বসাতে পারে। আর এক বিপদ হল সে রাজাকে গোপনে জানিয়ে দিতে পারে।

পরদিন ধর্মরাজের সঙ্গে কাজ করতে আর একজন প্রহরী এল। ধর্মরাজ রাজার দর্শনপ্রার্থীদের আড়ালে ডেকে নিজের প্রাপ্য নিয়ে নিল। এসব লক্ষ্য করে অন্য প্রহরী বলল, "আমি রাজাকে এসব বলে দেব।"

ধর্মরাজ বলল, "রাজাকে বললে তোমার কি লাভ হবে বন্ধু? তার চেয়ে আমি যা নিচ্ছি তার থেকে তোমাকে ভাগ দেব।"

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ও তোমার সবচেয়ে বড়ো ছেলে-বড় আদরের ছেলে...
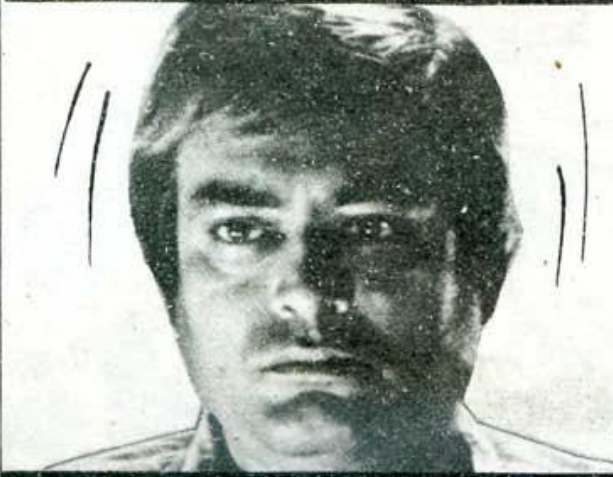
ওকে মেরো না, তোমার নিজের রক্ত বইছে ওর ধমনীতে—তোমার ছোট ছেলে সে...

তুমি কি পাগল হলে আনন্দ খুন করতে চাইছো নিজের বড় আদরের একমাত্র মেয়েকে...

শহরের সবচেয়ে সম্মানিত আর ধনী লোক তুমি! কি জ্বলছে তোমার মনে ...আনন্দ!

বি নাগি রেড্ডীর ছবি
—যেখানে
ক্যামেরা রয়েছে
মানুষের মনের কাছাকাছি—

মানুষের মনের গভীরের ছবি—
তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব

পরিচালনা ঃ কে এস্ সেতুমাধবন সংলাপ ঃ ইন্দ্ররাজ আনন্দ
গীতরচনা ঃ আনন্দ বক্সী সঙ্গীত ঃ রাজেশ রোশন

বিজয়া প্রোডাকসন্সকৃত ফিল্ম

"না আমি ঘুষের ভাগ চাই না।" অন্য প্রহরী বলল। ঐ প্রহরী সৎ ছিল। ধর্মরাজকে সন্দেহ করেই ঐ প্রহরীর সঙ্গে কাজ করার জন্য রাজা তাকে পাঠিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় ধর্মরাজ একটা ফন্দি আঁটল। যারা রাজাকে দর্শন করার জন্য এসেছিল তাদের সে বলল, "দেখুন ধর্মাত্মাগণ, এই লোকটা বলছে, আমি নাকি আপনাদের কাছে ঘুষ চেয়েছি। এই মিথ্যা অপবাদ এই প্রহরী সোজা রাজার কাছে জানিয়ে আসতে চাইছে। তাই ভাবছি, আপনাদের কাছে এই প্রহরী ঘুষ চেয়েছে বলে আমি রাজাকে জানিয়ে আসব, আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষী দেবেন।"

ধর্মরাজ কুড়ি বছর ধরে ঐ জায়গায় কাজ করছিল। যার যা কাজ, ঘুষ নিয়ে, সে যে কোন ভাবে করে দিত। ধর্মরাজ সেখানে না থাকলে তাদের কাজ কে করবে—এই নিয়ে ওদের মনে আশঙ্কা জাগল। সাত পাঁচ ভেবে, সেখানে যারা ছিল, তারা ধর্মরাজের পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজী হল। ফলে অন্য প্রহরীর মনে ভয় ঢুকল। সে আর একটি কথাও বলল না। মাসের শেষে সে যা মাইনে পেল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ধর্মরাজকে ভেট দিল।

দু মাস কেটে গেল। ঐ প্রহরীর বউ রাজার কাছে অভিযোগ করল, "মহারাজ, আমার স্বামী পুরো মাইনে বাড়িতে আনছে না।"

রাজা গোপনে তদন্ত করে ধর্মরাজকে সেখান থেকে সরিয়ে তার সেরেস্তায় ঘণ্টা বাজানোর কাজ দিলেন।

ধর্মরাজ ঘণ্টাবাদক হয়ে গোপনে

রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করল। "টাকা পয়সা দিলে তাড়াতাড়ি ছুটির ঘণ্টা বাজাব।" ধর্মরাজ ওদের বলল। কর্মচারীরা ধর্মরাজকে ঘুষ দিতে রাজী হল। ফলে ওরা তাড়াতাড়ি ছুটি পেত।

কয়েকমাস যেতে না যেতেই ধর্ম-রাজের অনেক টাকা হয়ে গেল। সে রাজধানীর মাঝখানে জমি কিনে বিরাট অট্টালিকা তৈরি করে ফেলল।

একদিন চন্দ্রবর্মার স্ত্রী তাঁকে বলল, "দিনের ঘণ্টাগুলো তাড়াতাড়ি পড়ে বিকেল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে ঘণ্টাগুলো অনেক দেরিতে পড়ে। এর যে কি কারণ বুঝতে পারছি না।" ব্যাপারটা চন্দ্রবর্মার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। তিনি পরের দিন অন্তঃপুরের বালিঘড়ির সামনে বসে লক্ষ্য করছিলেন।

সেরেস্তার কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত যে ঘণ্টা পড়ছিল, তার সঙ্গে বালিঘড়ির মিল ছিল। সারাদিনে একটু একটু আগে ঘণ্টাগুলো পড়ছিল এবং ছুটির ঘণ্টা এক ঘণ্টা আগে পড়ে গেল।

রাজা চন্দ্রবর্মা পরের দিন রাজসভায় ধর্মরাজের বিচার করলেন। ধর্মরাজকে

একেবারে চাকরি থেকে বরখাস্ত না করে সেনাপতির চাকরের পদে তাকে বহাল করলেন। সেখানে ধর্মরাজ টাকা পয়সা রোজগারের কোন রকম ধান্দা না করে নিজের কাজ করে গেল।

একদিন ধর্মরাজ সেনাপতির উদ্যানের গাছে গাছে জল দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে তার কানে এল সেনাপতি ও তার স্ত্রীর কথা। ধর্মরাজ আড়ালে দাঁড়িয়ে, কান খাড়া করে, ওদের কথা শুনতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সে সময় ওদের কথা শুনে

ধর্মরাজ বুঝল, সেনাপতি বাইরে বাঘের মত থাকলেও বউয়ের কাছে একেবারে ভেজা বেড়াল। সে চোখ বড় বড় করে দেখল। হাতের কাছে যা পাচ্ছিল তাই দিয়ে ঐ বউ সেনাপতিকে মারছিল।

কেউ দেখে ফেলছে কিনা, দেখার জন্য সেনাপতি এদিক ওদিক তাকাল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ধর্মরাজের উপর। বেরিয়ে এসে সেনাপতি ধর্মরাজকে কিছু বলার আগেই সে বলল, "সেনাপতি মশাই, আপনার ধৈর্য আছে। স্ত্রীর হাতে আপনি যে এত ধৈর্যের সঙ্গে মার খেতে পারেন তা যে শুনবে সেই অবাক হবে।" এই কথা শুনে সেনাপতি চমকে উঠল। সে কাউকে না বলার জন্য ধর্মরাজকে অনুরোধ করল।

"সেনাপতির বাড়িতে কেমন আছ? —এই প্রশ্ন আমাকে যদি রাজা করেন, তাহলে তো আমাকে সত্য ঘটনা ঢাকতে হবে। এত বড় সত্য আমি কেন ঢাকব বলুন?" ধর্মরাজ বলল।

ফলে সেনাপতি বাধ্য হল ধর্মরাজকে ঘুষ দিতে। তারপর সে সেনাপতির স্ত্রীর কাছেও ঘুষ নিল। ব্যাপারটা নিয়ে সেনাপতির অন্য চাকরদের মধ্যেও আলোচনা হল। মুখে মুখে, ঘটনার বিবরণ রাজার কানে পৌঁছে গেল।

রাজা ধর্মরাজকে ডেকে পাঠালেন। আড়ি পেতে শোনা এবং ঘুষ খাওয়ার অপরাধে রাজা চন্দ্রবর্মা তাকে কাজ থেকে বিতাড়িত করলেন। বহু বছর ঘুষ খাওয়ার ফলে ধর্মরাজের অনেক টাকা জমেছিল। তাই চাকরি যাওয়াতে তার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না।

চাকরি যাওয়ার পর ধর্মরাজ চারজন শিক্ষিত বেকার যুবককে চাকরি দিল।

ওদের কাজ হল চারজনে চারপ্রান্তে ঘুরে যা কিছু অদ্ভুত ঠেকবে তা লিখে আনা। ওদের লেখা থেকে কিছু কিছু ধর্মরাজ টুকে রাখত। অনেক খবর ধর্মরাজের বইয়ে লেখা হয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে লোকে জানতে পারল যে ধর্মরাজ একটি বই লিখেছে আর সে বইয়ে অনেক খবর আছে।

সে বছর ঘটা করে দুর্গাপূজা হল। দূর দূর থেকে অসংখ্য দর্শক ও ভক্ত রাজধানীর পূজো দেখতে এসেছিল। রাজা চন্দ্রবর্মা লক্ষ টাকার হীরের আংটি পরে পূজোর কদিন ঘোরাঘুরি করছিলেন।

বেশ কয়েকদিন পূজা উৎসব হল। ঐ কদিন রাজধানী গমগম করছিল। পূজা উৎসব শেষ হওয়ার পর রাজা লক্ষ্য করলেন তার হাতের আংটি হারিয়ে গেছে। রাজকর্মচারীরা আংটি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে শেষে রাজাকে বলল, "মহা-রাজ, ধর্মরাজের বইয়ে প্রত্যেক দিনের অনেক ঘটনা লেখা থাকে। সেই বই দেখলে হয়ত আংটির হদিশ পাওয়া যাবে।"

রাজা ধর্মরাজকে তার লেখা ঐ বই নিয়ে আসতে বললেন। তাঁর নির্দেশে ধর্মরাজ বই খুলে পড়তে লাগল, "পূজার শেষ দিনে, দক্ষিণ পাড়ার গাছের সঙ্গে

রাজার হাতীকে বেঁধে মাহুত ছুটে বাড়ির দিকে যাচ্ছে।”

যে এই খবর এনেছে তাকে রাজা চিনতে বললেন ঐ মাহুতকে। চিহ্নিত হওয়ার পর রাজা ঐ মাহুতকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ছুটে বাড়িতে গেলে কেন ?

“আপনি পায়ে হেঁটে উৎসব দেখবেন বলেছিলেন তাই আমি জরুরী কাজে বাড়ি গিয়েছিলাম।” মাহুত বলল।

ধর্মরাজের বইয়ের আর এক জায়গায় ছিল, “এবার কিন্তু আমাকে বেনারসী শাড়ি কিনে দিতে হবে। অনেক গয়না গড়াতে হবে।” রাজা এই কথাবার্তা পড়ে মাহুতকে ধমক দিতেই সে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “মহারাজ সেদিন হাতী থেকে নাবার সময় আপনার আংটিটা পড়ে গিয়েছিল। আমি তুলে নিয়ে বাড়ি গিয়ে সেটা বউকে দেখাতেই সে শাড়ি গয়না কিনে দিতে বলেছিল।” তারপর সে ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে আংটি এনে রাজাকে দিয়ে দিল।

আগেকার দিনে রাজা প্রজারা কেমন আছে তা নিজের চোখে দেখার জন্য ছদ্মবেশে বেরুতেন। বেরিয়ে অনেক কথা নিজের কানে শুনতেন, নিজের চোখে অনেক ঘটনা দেখতেন। কিন্তু রাজ্য বাড়ার পর রাজার পক্ষে সব কথা শোনা, সব কিছু দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। এই ঘটনার পর রাজা অনেকক্ষণ ভেবে ধর্মরাজ যে যুবকদের চাকরি দিয়েছিল তিনি তাদের গুপ্তচরের পদে বহাল করলেন এবং ধর্মরাজকে প্রধান গুপ্তচরের পদ দিলেন। সেদিন থেকেই গুপ্তচরের পদ সৃষ্টি হল এবং দেশে দেশে গুপ্তচর বাড়তে লাগল।

ভূতের পরামর্শ

গাঁয়ের শেষপ্রান্তে ছিল শ্মশান। ঐ শ্মশানে ছিল অনেক ভূত। ওদের মধ্যে একটি ভূত ছিল বুড়ো। অন্যেরা তার কাছে পরামর্শ চাইত।

একদিন ঐ বুড়ো ভূত বনেবাদাড়ে ঘুরে একটা ভাঙ্গা কুয়োর পাড়ে বসেছিল।

"কে? কে ওখানে? আমার জায়গায় কে বসেছে?" এই প্রশ্নগুলো শুনে ঐ ভূত চারদিকে তাকাতে লাগল। সে দেখতে পেল এক মেয়ে ভূতকে। তাকে ঐ ভূত বলল, "এটা তোমার জায়গা? এখানে আমি বসেছি তো কি হয়েছে? অনেক জায়গা আছে, তুমিও বসো না।" মেয়েভূত ঐ ভূতের পাশে বসল।

"আমি ঐ শ্মশানে থাকি। শ্মশানের ভূতগুলো যে-কোন ঝামেলায় পড়লে আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে।" ঐ ভূত এভাবে নিজের পরিচয় দিল।

তার কথা শুনে মেয়েভূত উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমিও একটা সমস্যায় পড়েছি। অনেক ভেবেও সমাধান করতে পারছি না। অত ভূতকে যখন পরামর্শ দাও, আমাকেও দিতে হবে।"

"বেশ তো, বল, তোমার কি সমস্যা।" ঐ ভূত বলল।

তখন মেয়েভূত বলল, "কাছাকাছি বট গাছে আমি থাকি। ঐ গাছের কাছে একটি বাড়ি আছে। পোড়ো বাড়ি। খালি ছিল এতদিন। কিছুদিন হল একটা গানের শিক্ষক ঐ বাড়িতে উঠেছে। ওর

দীপা দে
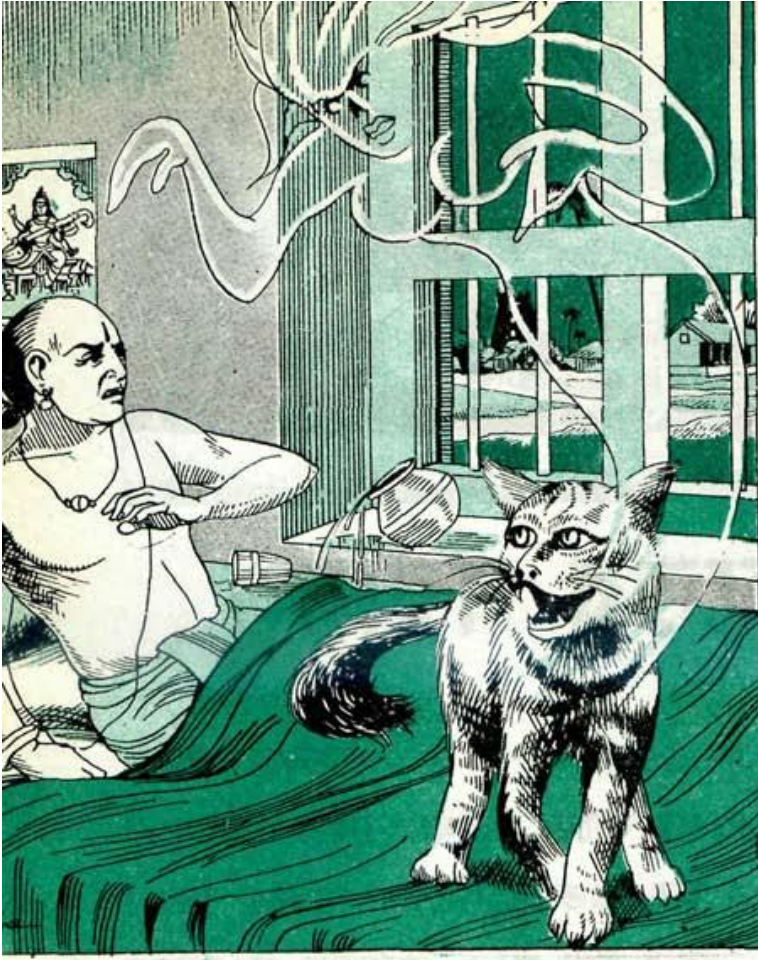
কাছে নানা জায়গার ছেলেমেয়ে এসে গান শেখে। এতদিন নিরিবিলিতে বেশ ছিলাম। ঐ শিক্ষককে আমি তাড়াতে চাই। কিভাবে তাড়াব ভেবে পাচ্ছি না।"

ঐ বুড়ো ভূত বলল, "এ আর এমন কি সমস্যা। এর চেয়ে আমি অনেক বড় বড় সমস্যা সমাধান করেছি। আমি যা বলছি তা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলে সে তাকে পরামর্শ দিল।

মেয়েভূত ঐ পরামর্শ শুনে খুব খুশী হয়ে সেই রাত্রেই সে ঐ পোড়ো বাড়িতে গেল। সে কালো বেড়ালের রূপ ধরে ভাঙ্গা স্বরে ডাকতে ডাকতে সেই শিক্ষকের ঘরে ঢুকল। বেড়ালের ডাক শুনে শিক্ষকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার চোখের সামনে বেড়াল ভূত হয়ে গেল। তখন শিক্ষক ভয় না পেয়ে ভূতকে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? এখানে কি কাজ?"

ভূত বিচিত্র ধ্বনি করে হাসতে হাসতে তাকে বলল, "আমি খুব খারাপ ধরণের ভূত। নানা রূপ ধরতে পারি। এক এক সময় এক এক রূপ ধরে আমি এই বাড়িতে ঘুরে বেড়াই।" বলে সে পেঁচার রূপ ধরে সারা ঘরে কয়েকবার পাক খেতেই শিক্ষক তাকে বলল, "দেখ, দয়া করে তুমি বিড়াল হয়েই ঘোরাঘুরি কর। ইঁদুরের জ্বালায় আমি আর এই ঘরে টিকতে পারছি না। তুমি বিড়াল হয়ে ঘুরলে ইঁদুরগুলো পালাবে। ইঁদুর পালানোর পরে তুমি টিকটিকির রূপ ধরে, যদি পার মশাগুলোকে শেষ কর।"

মেয়েভূত রেগে গিয়ে শিক্ষককে বলল, "তুমি আমাকে কি ভেবেছ? আমার আর কোন কাজ নেই? তোমার ঘরের ইঁদুর আর মশা তাড়াবো?" বলে সে চলে গেল।

পরেরদিন ঐ ভূত এলে তাকে সে বলল, "তোমার পরামর্শ মত কাজ করে কোন ফল পাইনি। বড় কঠিন লোক, টলাতে পারলাম না।"

"একটাতে না হলে আরেকটাতে হবে।" বলে ঐ ভূত পরামর্শ দিল।

তার পরামর্শ অনুসারে সেদিন রাত্রে মেয়েভূত শিক্ষকের ঘরের টালি সরিয়ে ফেলতে লাগল।

মাঝরাত্রে টালি সরানোর শব্দ শুনে শিক্ষক বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি ভূত। কিছু একটা না করে থাকতে পারিনা।" বলে মেয়েভূত তার জবাব শোনার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল।

"কি হল, থামিয়ে দিলে কেন? আমিও ভাবছিলাম টালিগুলো সরিয়ে ছাদ তুলব। কুলিদের দিয়ে এসব কাজ করতে গেলে অনেক খরচ। সকালের আগে সমস্ত টালি সরিয়ে ফেল।" বলে শিক্ষক ঘুমিয়ে পড়ল।

"আমাকে চাকরাণী পেয়েছ? আমাকে টালি সরাতে বলে নিজে দিব্যি গাছের নীচে নাক ডেকে ঘুমোবে?" বলে সে পেঁচার রূপ ধরে বুড়োভূতর কাছে গেল।
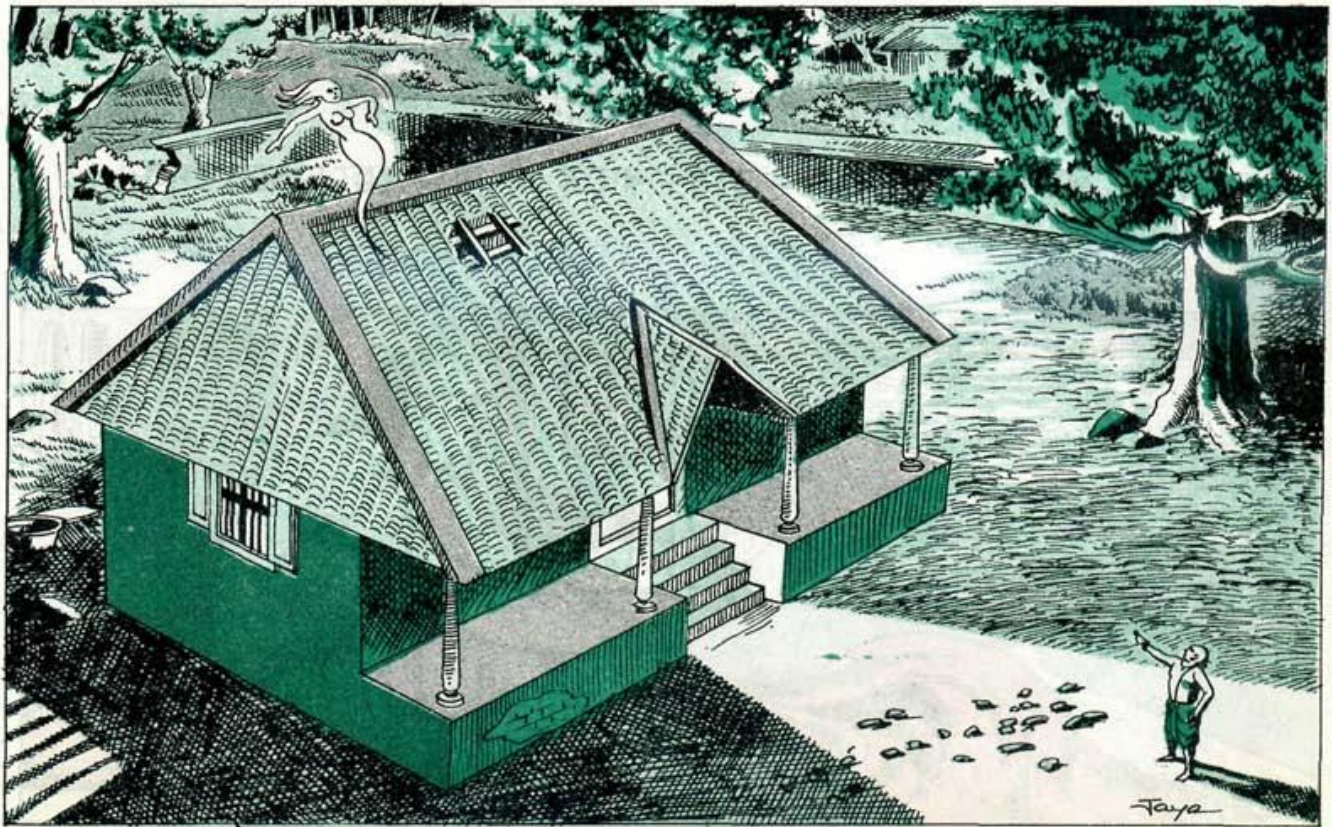
"খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে ! এবার কাজ হয়েছে তো ?" বুড়ো ভূত বলল।

"তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। ওকে আমি কি সরাব, ওই আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে। তোমার পরামর্শে কোন কাজ হচ্ছে না।" মেয়েভূত বলল।

পরপর দুটো উপায় ব্যর্থ হওয়ায় ঐ ভূত আর একটা পরামর্শ দিল।

পরেরদিন রাত্রে মেয়েভূত গিয়ে শিক্ষককে ঠেলে তুলল।

"দিলে তো ঘুমটা মাটি করে। ঘুম ভেঙ্গে দিলে কেন ?" শিক্ষক বলল।

"তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আমি বহুকাল থেকে এই বাড়িতে আছি। যখন তখন গানের আসর বসাও। ভীষণ হৈ চৈ হয়।" মেয়েভূত বলল।

"তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ ? তুমি জান এই গানের জন্যই আমি ঘর ভাড়া পাইনা।" শিক্ষক বলল।

মেয়েভূতের মুখ ঝুলে গেল। সে কিছুক্ষন ভেবে বলল, "কাল রাত থেকে আমাকে গান শেখাবে। এতে যদি তুমি রাজী না হও তা হলে কালকেই আমি গানের ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হব।"

মেয়েভূতের এই কথা শুনে গানের শিক্ষক অনেক কথাই ভাবল। সত্য চাপা থাকে না। গানের শিক্ষক হিসেবে এখন সে ভাড়ায় ঘর পায়না। এরপর, মেয়েভূতকে গান শেখালে, তা যদি প্রচার হয়ে যায় তখন আর রক্ষে থাকবে না। দেশের লোক তাকে 'ভূতের শিক্ষক' বলে দেশছাড়া করবে। শিক্ষক মেয়েভূতের শিক্ষক হওয়ার ভয়ে ভোর রাত্রে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

মূর্খের কাহিনী

কোন এক গ্রামে রাম নামে এক চাষী ছিল। তার ছিল দু বিঘা জমি। নিজের জমিতে সে চাষ করত। ফসল কাটার মুখে সোমনাথের গাইবাছুর এসে রামের ফসল খেয়ে ফেলল। রাম সোমনাথের কাছে এক হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ চাইল। সোমনাথ এক পয়সাও দিতে চাইল না।

রাম পঞ্চায়েত বসাল। কিন্তু পঞ্চায়েতে যারা বসল তারা সোমনাথের ও রামের উপর দোষ চাপালো। ওদের মতে, রামের উচিত ছিল, ক্ষেতে পাহারার ব্যবস্থা করা। ওরা সোমনাথেরও অপরাধ হয়েছে বলে জানাল। তার উচিত ছিল, পোষা গাইবাছুর ভালভাবে বেঁধে রাখা। সোমনাথকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হল। এই হল পঞ্চায়েতের রায়।

এই রায় সোমনাথের পছন্দ হল না। সে গেল মুন্সেফের কাছে। মুন্সেফকে বিচার করতে বলল। ঐ মুন্সেফ ছিল ঘুষখোর। ক্ষেতে বেড়া না দেওয়ার জন্য সে সোমনাথের চেয়ে রামের উপর বেশী দোষ চাপিয়ে দিল। ফলে সোমনাথকে জরিমানা দিতে হল না। সে বিচারের আগে মুন্সেফকে আড়াইশো টাকা ঘুষ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

রাম মুন্সেফের বিচারের রায় শুনে খুশী হতে পারল না। সে ঐ অঞ্চলের অধিপতির কাছে বিচারের জন্য গেল। সেও ছিল ঘুষখোর। রাম তাকে আড়াইশো

অনিমা দেবী

টাকা ঘুষ দিয়ে বিচারের রায় যাতে তার পক্ষে হয় তার চেষ্টা করল।

"বেড়া যদি দিতে হয়, সারা গ্রামের চারদিকে বেড়া দিতে হয়। একটা ফুল-গাছ লাগালেও বেড়া দিতে হবে ? রামের ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে সোমনাথ। সোমনাথকেই এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।" বলল ঐ অঞ্চলের অধিপতি।

সোমনাথ এই রায় শুনে রেগে গিয়ে জিলা অধিপতির কাছে বিচার চাইল। জিলা অধিপতি আরও বড় ঘুষখোর ছিল। তার কাছে যেতেই সে সোমনাথকে বলল, "অঞ্চল অধিপতি তো তোমার একহাজার টাকা জরিমানা করেছে। এখন আমাকে যদি পাঁচশো টাকা দাও তাহলে রায় যাতে তোমার পক্ষে হয় তার চেষ্টা করব।"

সোমনাথ ভাবল, তবু আড়াইশো লাভ থাকছে। পাঁচশো পেয়ে জেলা অধিপতি সোমনাথের পক্ষে রায় দিল।

রাম ভীষণ রেগে গেল। সে আরও উপরে গেল। প্রদেশ অধিপতি রামের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ঘুষ নিয়ে রামের পক্ষে রায় দিল।

সোমনাথ ছুটে গেল রাষ্ট্রের অধিপতির কাছে। সে ঘুষ খেতো না। সে পঞ্চায়েতের রায়কেই সঠিক রায় বলে ঘোষণা করল। ফলে সোমনাথকে পাঁচশো টাকা জরিমানা রামের হাতে দিতে হল।

বিচারলয় থেকে ফেরার পথে রাম ও সোমনাথ হিসেব করে দেখল তাদের প্রত্যেককে সাড়ে সাতশো টাকা করে ঘুষ দিতে হয়েছে। ঘুষখোরদের পেছনে ছুটেছিল বলেই যে তাদের সাড়ে সাতশো করে টাকা জলে গেছে তা ওরা বুঝতে পারল।
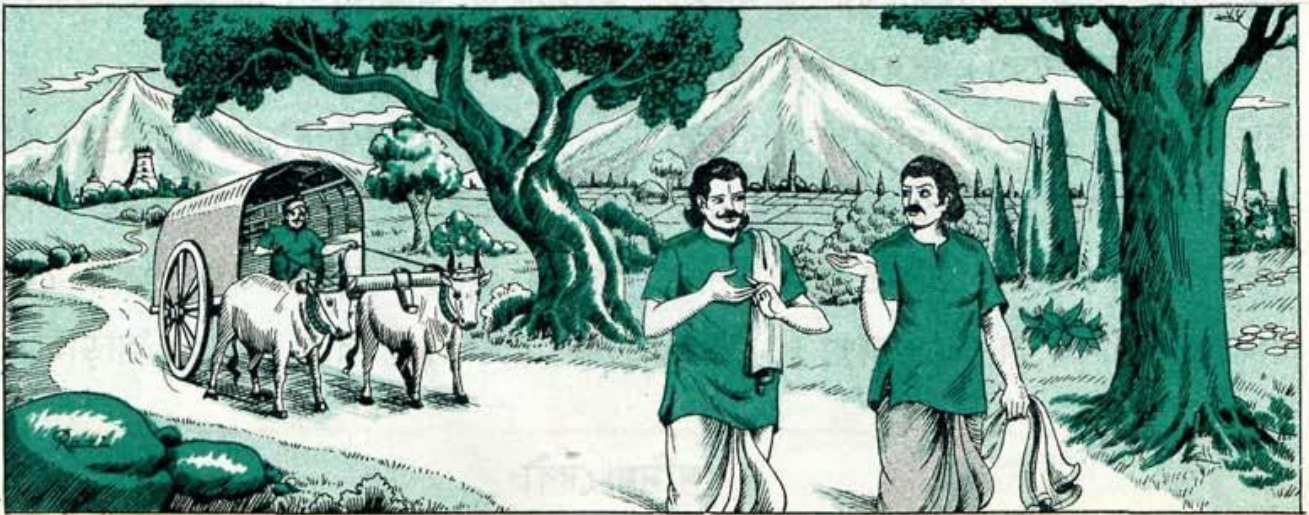
মায়া মমতা

রাজার জন্মদিন। সবাই উৎসবে যোগদান করেছে। জমিদার ও সামন্তরা নানা ধরণের উপহার এনে রাজাকে দিচ্ছিল। এক শিকারী হরিণশাবক উপহার দিল। রাজা শিকারীকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন।

রাজা অত স্বর্ণমুদ্রা শিকারীকে দিচ্ছেন দেখে মন্ত্রী স্থির থাকতে না পেরে বলল, "মহারাজ, একটা শিকারীকে এত স্বর্ণমুদ্রা দেবেন ভাবতে পারিনি। নিশ্চয় কারণ আছে। অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হব।

"ঠিকই বলেছ মহামন্ত্রী । একটা কারণ আছে। এসব নিরীহ প্রাণীকে আমি মনেপ্রাণে ভালোবাসি। শিকারীকে আমি বেশী স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ায় সে বার বার হরিণ এনে আমাকে উপহার দেবে। আমার হাতে যে হরিণ পড়বে সে হরিণ বাঁচবে।" রাজা বললেন।

"মহারাজ, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু এরপর থেকে স্বর্ণমুদ্রার লোভে অনেকেই হরিণ শিকার করবে। কিছু মরে যেতেও পারে। তাই 'হরিণ ধরা নিষিদ্ধ' বলে আপনি ঘোষণা করলে আর কেউ হরিণ ধরবে না। আপনার মহৎ উদ্দেশ্যও সফল হবে।" মন্ত্রী বলল।

রাজা লজ্জা পেয়ে মন্ত্রীর কথামতই হরিণ ধরা নিষিদ্ধ করলেন।
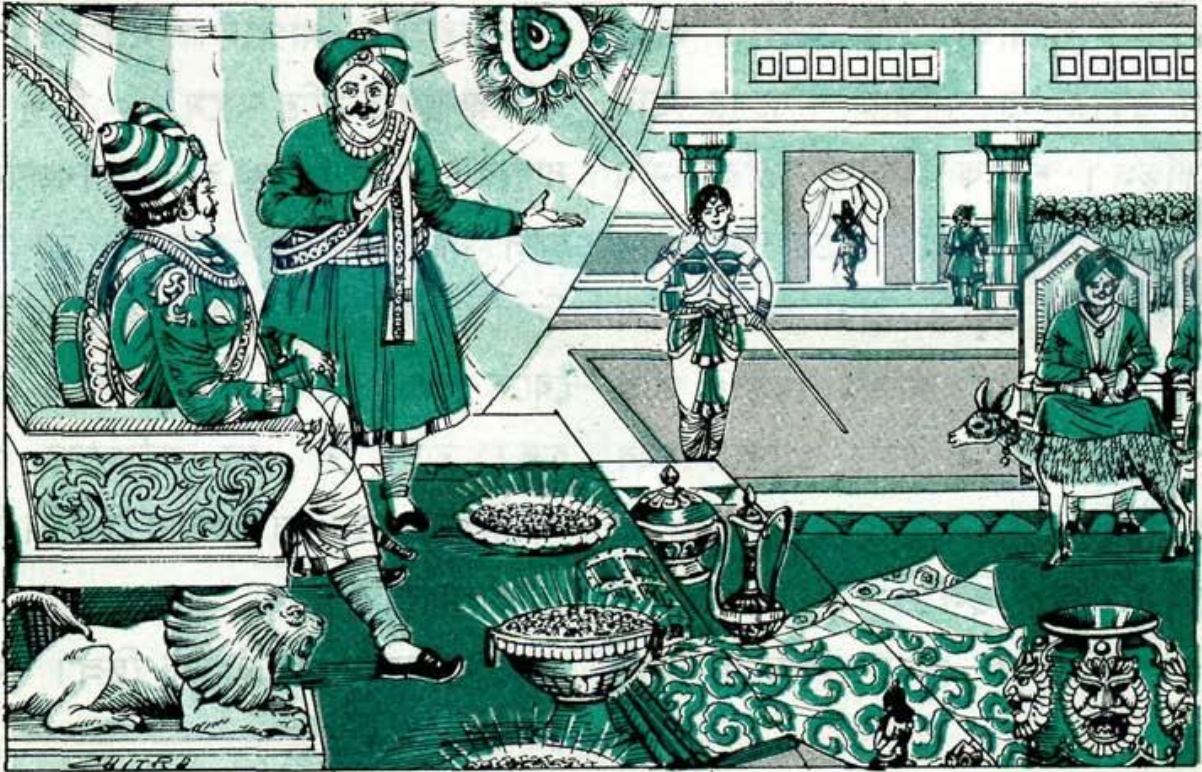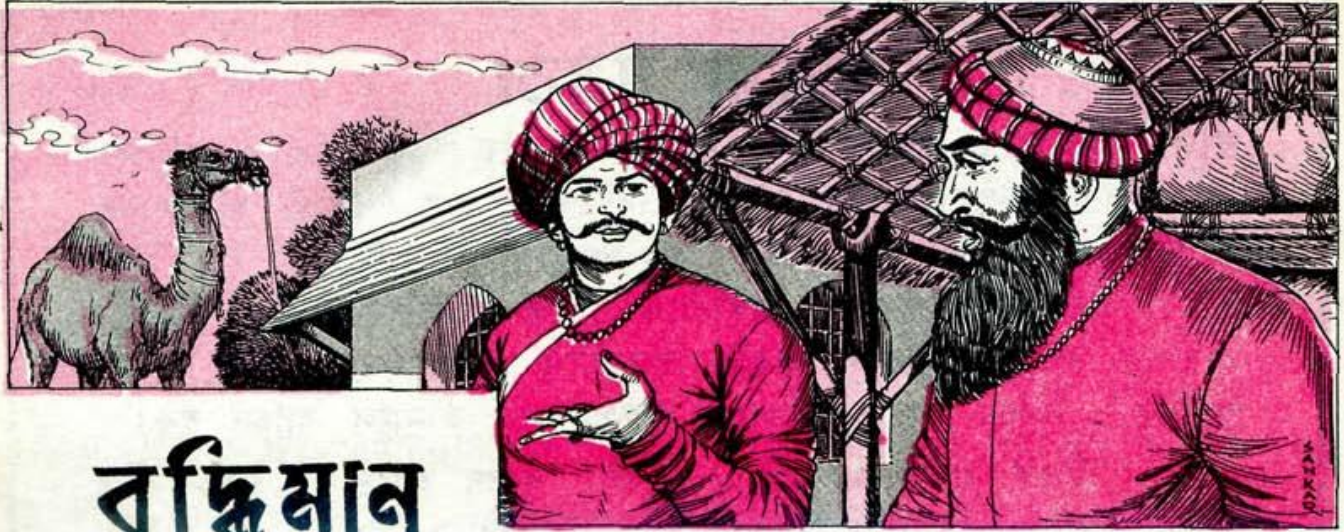
বুদ্ধিমান

ওরুগল্লু পতনের সঙ্গে সঙ্গে কাকতীয় সাম্রাজ্য অস্তমিত হল। কাকতীয়র সম্রাট ছিলেন প্রতাপ রুদ্র। তাঁর কোষাধ্যক্ষ হরিহর ও বুক্করায়। ওরা দুই ভাই। ওরা পরবর্তীকালে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সৃষ্টি করল। হরিহরের মৃত্যুর পর বুক্করায় শাসনের ভার নিয়েছিল। শাসক হিসাবে তার সুনাম হয়েছিল। তখনকার দিনে মুসলমান শাসিত অঞ্চল থেকে যারা তার দেশে আসত তাদের সে আশ্রয় দিত। তাই বলে সে অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করত না। সমস্ত ধর্মের প্রতি তার সমান দৃষ্টি ছিল।

ওরুগল্লু থেকে কোন হিন্দুকে অন্য কোথাও যেতে হলে সব কিছু সেখানে রেখে যেতে হত। সেখানকার কানাকড়িও নিয়ে যাওয়ার অধিকার তার থাকত না। এই বাধা নিষেধ মুসলমানদের বেলায় ছিল না। ফলে যেসব হিন্দুরা অন্যত্র যেতে চাইত তাদের গোপনে পালাতে হত।

ওরুগল্লুতে মতি নামে এক হিন্দু ব্যবসাদার ছিল। বিরক্ত হয়ে সে বিজয়নগর চলে যাওয়ার কথা ভাবল। ঘুষ দিয়ে দিয়ে সে ফতুর হয়ে যাচ্ছিল। জানিয়ে যেতে হলে তাকে এক কাপড়ে যেতে হত। তাই সে এক ফকিরের সঙ্গে আলাপ জমাল। সে সবসময় চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াত।

ঐ ফকিরের একটি উট ছিল। সে ঐ

নিরঞ্জন মাইতি

উট নিয়ে বহু তীর্থস্থান ঘুরে এসেছিল। ফলে তার নামই হয়ে গিয়ে ছিল ফকির। সে মতিকে সাহায্য করতে রাজী হল। মতির যত সোনাদানা মনিমুক্তা ছিল সব যদি পাচার করতে পারে তাহলে বিজয়নগরে যাওয়ার পর একলক্ষ টাকা দিতে মতি রাজী হল।

কিভাবে উটের পিঠে চড়ে ফকির বিজয়নগর যাবে, সেখানে কতদিন থাকবে আবার কবে সেখান থেকে ফিরবে সব ঠিক হয়ে গেল। ফকিরের সঙ্গে মতির যাওয়া বিপদজনক ভেবে সে গেল না।

ফকির চলে যাওয়ার পনের দিন পরে মতি গোপনে বিজয়নগরে চলে গেল। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও ফকিরকে সে পেলনা।

কারণ অত সোনাদানা, মণিমুক্তা দেখে ফকির লোভ সামলাতে পারল না। সে বিজয়নগরে গিয়েই দাড়ি কামিয়ে হিন্দু ব্যবসায়ীর পোশাক পরে সোনা ও মণিমুক্তা বিক্রি করে দিল।

মতি পথেঘাটে ফকিরকে খুঁজতে খুঁজতে একদিন চিনতে না পেরে ঐ ব্যবসায়ী বেশধারী ফকিরকেই সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, একটা উট দেখেছেন? ঐ
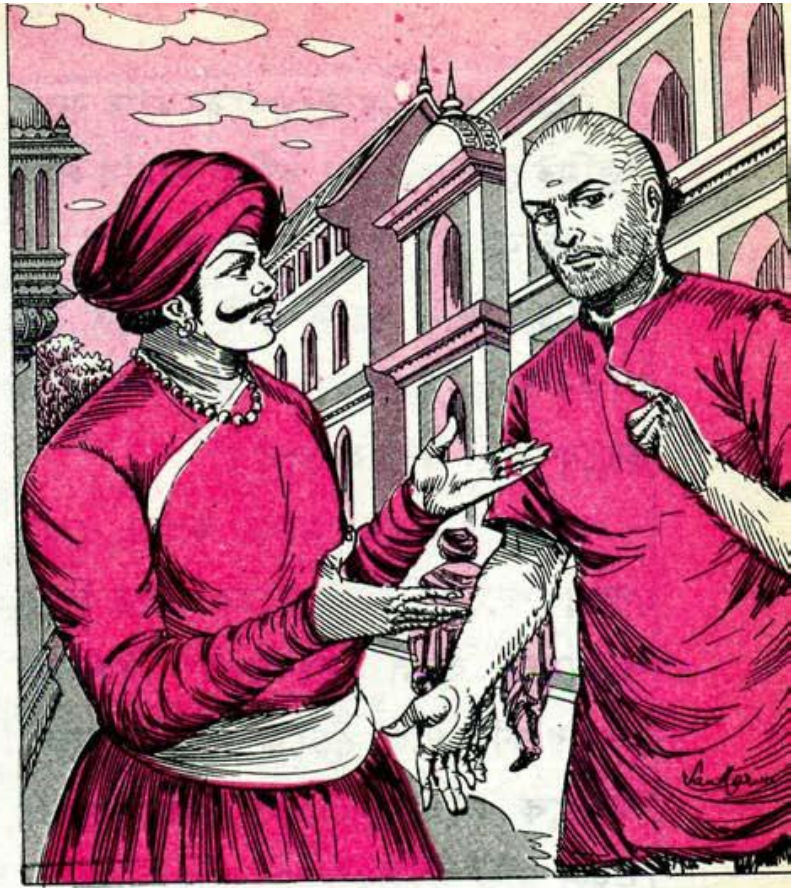
উটের পিঠে ফকির বসেছিল।"

ফকির মতিকে প্রশ্ন করল, "ঐ ফকি-রের লম্বা দাড়ি ছিল না?"

"ঠিক ধরেছেন।" মতি বলল।

"কালকেই তো আমি ওকে দেখেছি। ওর কাছে অনেক সোনা মণিমুক্তা ছিল। আমাকে কিনতে বলেছিল। আমি নিতে রাজী হইনি। তারপর আর এক ব্যবসায়ী জুটে গেল। ওরা নাকি বাগদাদ যাবে। যাবে কি কালকেই রওনা হয়ে গেছে কে জানে।" বলে ফকির অভ্যেস মত চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে গেল।

তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে মতি বলল, "তুমিই সেই ফকির। তুমিই আমার সমস্ত সোনাদানা চুরি করার তাল করছ।"

"ছি, ছি, আমি সেই উটে বসা ফকির হতে যাবো কেন?" ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারী ফকির বলল।

ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। শেষে মতি বুক্করায়ের-কাছে গিয়ে অভিযোগ করল ফকিরের বিরুদ্ধে। বুক্করায় ফকিরকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, "মতিকে মণিমুক্তা ওসব এই মুহূর্তে ফেরত দাও ফকির।"

"আমি ফকির নই।" বলল ফকির।

"তাহলে মতি তোমাকে ফকির বলে ডাকছে কেন?" কিছুক্ষণ ভেবে বুক্করায় জিজ্ঞেস করল।

"আমি ব্যবসাদার। ও কিভাবে জানতে পেরেছে যে আমার কাছে অনেক টাকাপয়সা আছে। যাদের কিছুই নেই তারা যাদের আছে তাদের ঈর্ষা করে। তাই, ফন্দি করে, আমাকে ফতুর করতে চাইছে।" ফকির বলল।

বুক্করায় একমুহূর্ত ভেবে বলল, "মতির অভিযোগ টিকতে পারে না।" তারপর ফকিরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "তোমার কোন দোষ নেই, তুমি মুক্ত, তুমি যেতে পার।"

ফকির মহানন্দে ঝট্ করে যাওয়ার জন্য রওনা হতেই বুক্করায় চিৎকার করে বলল, "ঐ ফকিরকে একটু দাঁড়াতে বল তো।" কেউ কিছু বলার আগেই ফকির দাঁড়িয়ে পড়ল। বুক্করায়ের আর সন্দেহ রইল না যে সেই লোকটাই ফকির। মতির অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হল। মতি তার হারানো মণিমুক্তা ফিরে পেল। ফকিরকে কঠোর শাস্তি পেতে হল।

স্বামীর জিদ

এক ছিল রাম। তার বউয়ের নাম ছিল রাণী। রাণী যা বলত রামের তা ভালো লাগত না। তুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি লেগেই থাকত। একবার পূজোর সময় রাণী বাপের বাড়ী যেতে চাইল। শুনেই রাম বলল, "বাপের বাড়ি যাওয়া চলবে না। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাক।"

সেদিন রাত্রে রাণীর দাদা কোন একটা কাজে ওদের গ্রামে এল। রাণীকে একফাঁকে দেখে যেতে সে এল। রাণী সুযোগ বুঝে রামের সমস্ত আচরণের কথা দাদাকে জানাল। রাণীর দাদার নাম রসরাজ। সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে সকালে উঠে যাওয়ার আগে রসরাজ রামকে বলল, "রাম, আমার নিজের বোনের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বাধছে। পূজোর সময় আমি ওকে বাড়িতে আসতে বলেছিলাম। তুমি নাকি তাকে পাঠাতে রাজী হয়েছিলে। কিন্তু ওর আসার ইচ্ছে নেই।"

পর মুহূর্তেই রাম ঘরে ঢুকে রাণীকে বলল, "তুমি নাকি বাপের বাড়ি যেতে চাও না। যাবে না কেন? এক্ষুণি রওনা হতে হবে।"

"আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। নেহাৎ যদি বাধ্য কর পূজোর সময় সকালে গিয়ে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসব।" রাণী বলল।

"কোন কথা শুনতে চাই না। এক্ষুণি রওনা হও। পূজো কাটিয়ে আসবে।" বলে রাম গাড়ি আনতে গেল।

জ্যোতিষীর গনণা

শহরের বিদ্যাপীঠের পাঠ শেষ করে সুধীর ও সুরেন্দ্র নামে দুজন যুবক নিজেদের গ্রামের দিকে রওনা হল। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। ওরা পাশাপাশি গ্রামে থাকত।

পথে পড়ল ঘন বন। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল। সৌভাগ্যবশত ওরা কাছেই একটা পোড়ো মন্দির দেখতে পেল। ছুটে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিল। মন্দিরে ঢুকে, কিছুক্ষণ কাটাতে না কাটাতেই ওদের নজরে পড়ল এক সাধুর উপর।

সুধীর ও সুরেন্দ্র ভাবতে পারেনি যে ঐ মন্দিরে কেউ ছিল। ওদের কোন প্রশ্ন করার আগেই সাধু বলল, "আমি এক সিদ্ধান্তে অটল সাধু। দেশে-দেশে, তীর্থে-তীর্থে ঘুরি, তবে লোকজনের ভীড় আমার ভালো লাগে না। জ্যোতিষী বিদ্যায় আমার কিছু জ্ঞান আছে।"

সুরেন্দ্র বরাবর জ্যোতিষীকে পেলেই হাত দেখাত। সে ঐ সাধুকে হাত দেখার জন্য অনুরোধ করল।

"ভবিষ্যতে কি হবে তা জেনে মানুষ কিছুই করতে পারে না। যা ঘটার তা ঘটেই যায়। আমি তাই, কারও ভবিষ্যৎ জানাই না।" বলল সাধু।

"যারা পারে না, হাত দেখার যাদের কোন ক্ষমতাই নেই, একমাত্র তারাই এই ধরণের কথা বলে।" সুরেন্দ্র যেন খোঁচা মেরে বলল।

"তোমাদের এখানে আসার আগে

নিরুপমা সেনগুপ্তা

আমি বিদর্ভ দেশের ভবিষ্যৎ গনণা করছিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ দেশে বিরাট পরিবর্তন হবে। বর্তমানে এক অক্ষম মানুষ ঐ দেশ শাসন করছে। দু-চারদিনের মধ্যেই তাকে একজন হত্যা করবে। যে হত্যা করবে সে কিন্তু রাজা হতে পারবেনা, হবে আরেকজন। আমার গনণা মিথ্যা হয় না। "সাধু বলল।

সুরেন্দ্র আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। সুধীর জ্যোতিষীদের কথা কোনদিন বিশ্বাস করতো না। তাই সে কোন কথা বলল না।

এতক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেল। দুই বন্ধু সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে আবার পথ ধরল। বন পথ পেরিয়ে ওরা যে মোড়ে পা রাখল সেখান থেকে সোজা যাওয়া যায় বিদর্ভ দেশে। বিপরীত দিকে গেলে ওরা পোঁছাবে নিজেদের দেশে।

সুরেন্দ্র পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সুধীরকে বলল, "বিদর্ভ দেশের ঘটনা জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। ওখানে গিয়ে যদি দেখি বিদর্ভ রাজা সত্যি অপদার্থ, ওর অপদার্থতার ফলে প্রজারা কষ্টে আছে তাহলে আমিই বিদর্ভ রাজাকে মেরে ফেলব। ঐ ধরণের রাজারা মরে গেলে প্রজাদের মঙ্গল হয়।"
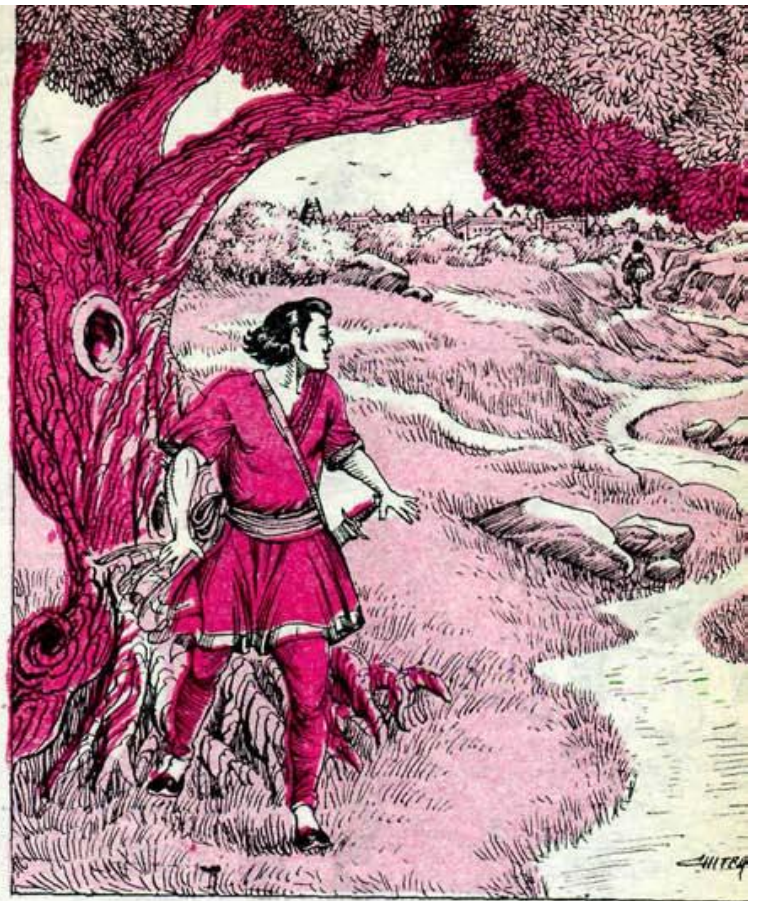
সুধীর অবাক হয়ে বলল, "ঐ সাধুর কথা শুনে তুমি ঝামেলায় পড়তে চাইছ? অন্য দেশের প্রজাদের উপকার করতে যাওয়ার তোমার কি দরকার? চল, চল, নিজেদের পথ ধরে বাড়ি যাই। তাছাড়া সাধুর আর একটা কথা তো শুনলে। ঐ রাজাকে যে মেরে ফেলবে সে তো আর রাজা হবে না। তাহলে তুমি তো রাজা হতে পারছ না, হবে অন্য জন। তোমার কি ফল হবে?"
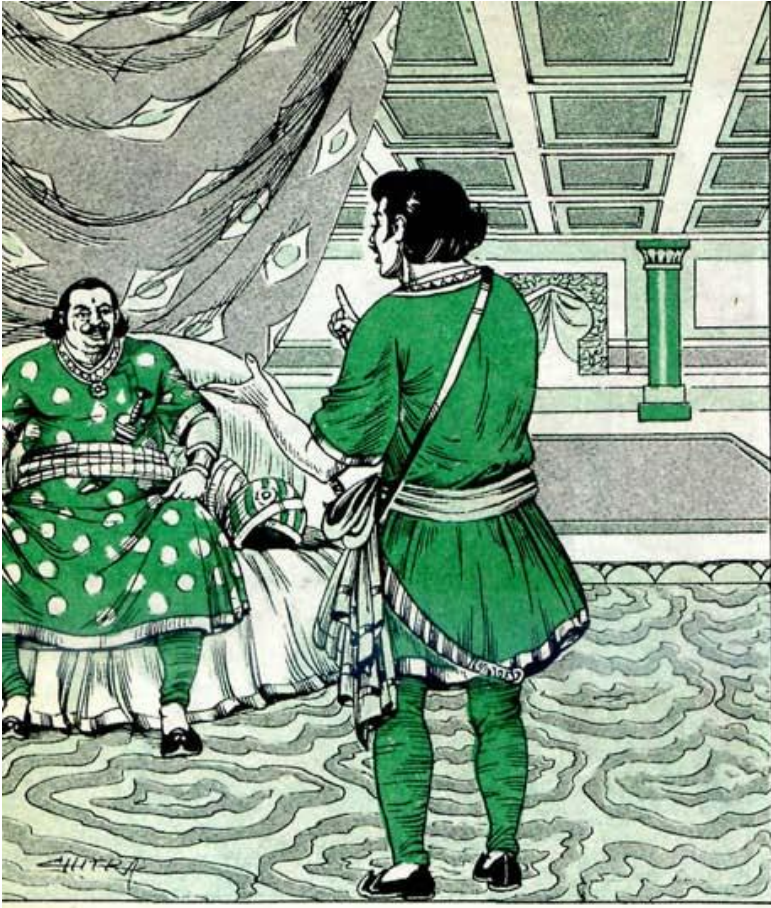
"ফল আমি চাই না। তুমি এখন যাও। আমার কাজ এখন আমাকে করতে দাও। আমার কাজের ফলে যদি অন্য লোক ফলভোগ করে তাতে মন্দ কি।" বলে সুরেন্দ্র বিদর্ভ দেশে যাওয়ার পথ ধরল।

সুধীরের পা নড়ল না। বন্ধু যখন বিপদে পড়তে যাচ্ছে তখন তাকে এড়িয়ে যাওয়া বন্ধুর কর্তব্য নয়। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাই বন্ধুর কর্তব্য। এই কথা ভেবে সুধীর সুরেন্দ্রের পেছনে পেছনে বিদর্ভ দেশের দিকে যে পথ গেছে সেই পথে এগিয়ে গেল।

সুরেন্দ্র সোজা বিদর্ভ দেশের রাজধানীতে গেল। সেখানে এক ধর্মশালায় সে উঠল। সেটা আড়াল থেকে লক্ষ্য করে সুধীর গেল মন্ত্রীর কাছে। তার নাম কালকেশী। নিজের পরিচয় সে তাকে দিল। সুরেন্দ্র যে তার বন্ধু, সে যে ধর্মশালায় উঠেছে তাও জানাল। কেন যে সুরেন্দ্র বিদর্ভ দেশে এসেছে তা জানিয়ে সুধীর বলল, "মাত্র এক সপ্তাহের জন্য আপনি আমার বন্ধুকে বন্দী করে রাখুন। এক সপ্তাহ কেটে গেলে রাজার বিপদ কেটে যাবে। আমিও আমার বন্ধুকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারব। আমি কথা দিচ্ছি, তারপর আমার বন্ধুকে দিয়ে আর কোন হত্যাকাণ্ড হবে না।"

"আমার রাজাকে যে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসবে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেওয়াই আমার কর্তব্য। তবে এখন আপনার অনুরোধে ওকে বন্দী করিয়ে রাখছি। এক সপ্তাহ পরে আমি তাকে মুক্তি দেব। আপনি তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন।" বলল কালকেশী।

মন্ত্রীর কথা শুনে সুধীর নিশ্চিন্ত হল। সে গোপনে অন্য এক ধর্মশালায় এক

সপ্তাহের জন্য থাকা ঠিক করল।

কিন্তু পরের দিন সকালেই সুধীরের কানে একটি খবর এল। সুবেন্দ্র নাকি আগের দিন রাত্রেই বিদর্ভ রাজাকে হত্যা করে তৎক্ষণাৎ রাজার দেহরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

এত তাড়াতাড়ি যে এটা ঘটে যাবে তা সুধীর ভাবতে পারেনি। খবরটা শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে সে গেল মন্ত্রীর কাছে। তাকে বলল, "এই হত্যা যাতে না হয় তার জন্যই তো আমি আগেভাগে আপনার কাছে গিয়ে, আমার বন্ধুকে বন্দী করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আপনি কি তক্ষুণি বন্দী করেন নি ? আপনি করবেন না জানতে পারলে আমি নিজেই অন্য ব্যবস্থা করতাম।"

কালকেশী দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে বলল, "আপনার বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে বন্দী করতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হল, আমি যে বন্দী করতে যাচ্ছি তা আপনার বন্ধু টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে সে পালিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি যে সে রাজাকে মেরে ফেলবে আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। এখন তাকে মৃত্যু-দণ্ড দিতেই হবে।"
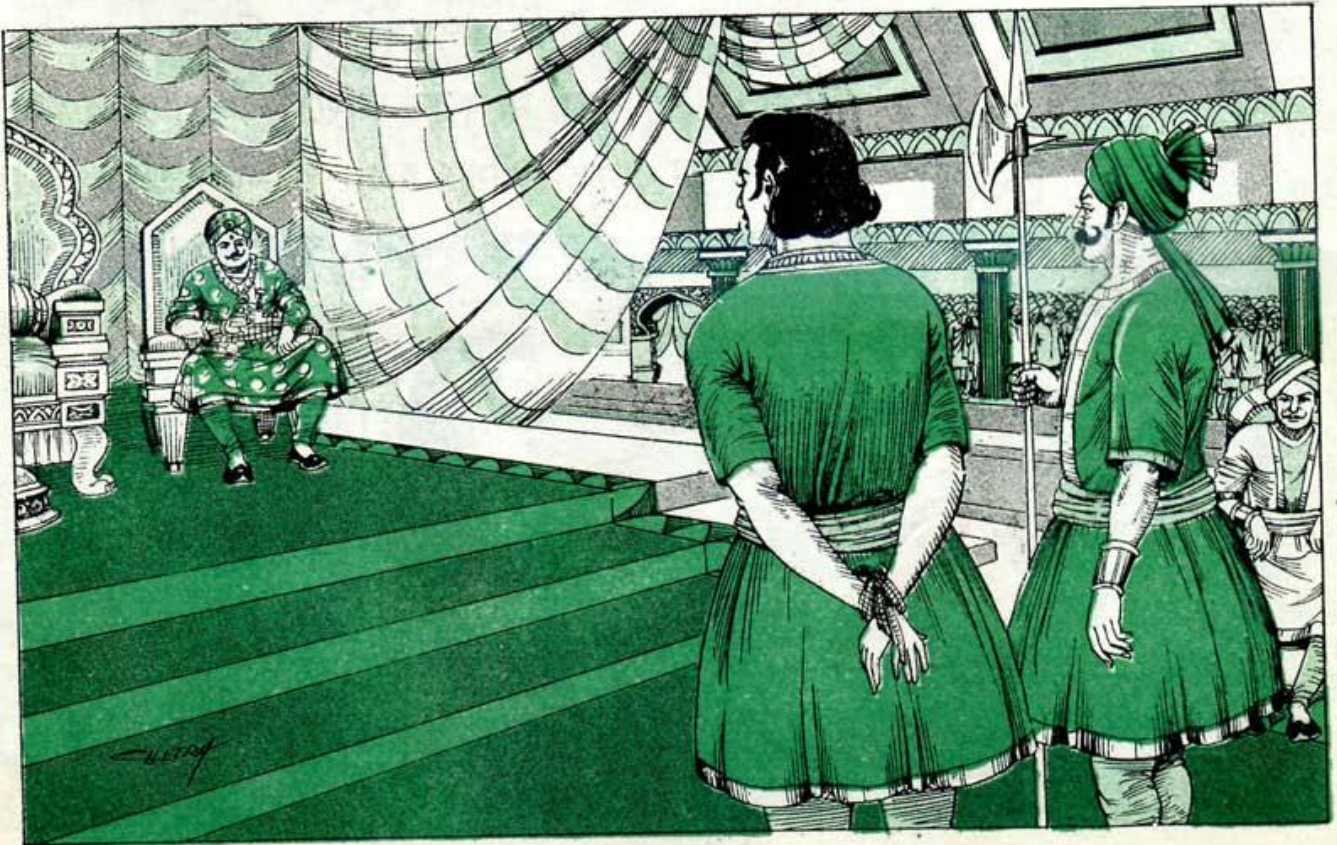
চাঁদমামা

সংস্থাপক : চক্রপাণি

নিয়ন্ত্রণ : বি. নাগি রেড্ডি

চাঁদমামায় দুটি প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকে একই পোষ্টকার্ডে দুটি প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ফলে ঐ কার্ডগুলি বাতিল হচ্ছে। ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ও গল্প নাম-করণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে পৃথক পৃথক পোষ্টকার্ডে লিখে পাঠাতে হবে। যে কোন পাঠক পাঠিকা এই প্রতিযোগিতা দুটিতে যোগদান করতে পারেন। খাম অথবা ইনল্যাণ্ডে লিখে পাঠালে তা বাতিল হতে বাধ্য। তাই আর একবার অনুরোধ করা হচ্ছে পাঠক-পাঠিকারা যেন একমাত্র পোষ্ট-কার্ডেই লিখে পাঠান। চিঠিগুলো যেহেতু মাদ্রাজে যায় সেহেতু বাংলায় ঠিকানা থাকলে সেখানকার ডাকবিভাগের পক্ষে চিঠি বিলি করা অসুবিধা হতে পারে। ফলে বিলম্ব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাই ঠিকানা ইংরেজিতেই লেখা উচিত।

খণ্ড ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সংখ্যা ৮

প্রতি সংখ্যা ১.২৫ বাৎসরিক চাঁদা ১৫.০০

কিছুদিন পরে রাজধানীতে আর একটি খবর ছড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রী কালকেশী নাকি পরের দিন সিংহাসনে বসবেন। সুরেন্দ্রকে ফাঁসি দেওয়া, এবং কালকেশীর সিংহাসনে বসা নাকি একসঙ্গে ঘটবে।

সুধীর রাজসভায় গেল। সভায় লোকের ভীষণ ভীড় ছিল। সিংহাসনের পাশের একটি আসনে কালকেশী বসেছিল।

সুধীর কালকেশীর কাছে গিয়ে বলল, "প্রভু, এই রাজদ্রোহীকে মেরে ফেলার দায়িত্ব আমাকে দিন।"

কালকেশী সম্মত হল।

সুধীর তরবারি হাতে নিয়ে সুরেন্দ্রের দিকে এক পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে, কি এক প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে কালকেশীর কাছে এসে তার মুণ্ডু কেটে ফেলল।

শুধু রাজাই নয়, মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যে সবাই ক্ষুব্ধ ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ সকলের চোখে-মুখে আনন্দের আভাস ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকের মুখে শোনা গেল, "আমাদের দেশের রাজা হওয়া উচিত সুরেন্দ্রের।" তখন সুরেন্দ্র সুধীরকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করল, "তুমি কিসের জন্য কালকেশীকে হত্যা করেছ, আমাকে বাঁচাতে না সাধুর ভবিষ্যৎ গনণা মিথ্যা প্রমাণ করতে?"

"কোনটাই ঠিক নয়। আসলে কাল-কেশীর নিজের মনেই রাজা হওয়ার বাসনা ছিল।" সুধীর বলল।

সুরেন্দ্র বলল, "বন্ধু, কালকেশী মিথ্যাবাদী। ও নিজেই রাজাকে হত্যা করে আমাকে বন্দী করেছে।" তখন সুধীর বুঝল যে সে যদি কালকেশীকে হত্যা না করত তাহলে জ্যোতিষীর গনণা মিথ্যা প্রমাণ হত। যা ঘটল তাতে সুধীর ও সুরেন্দ্র দুজনেই খুশী হল।
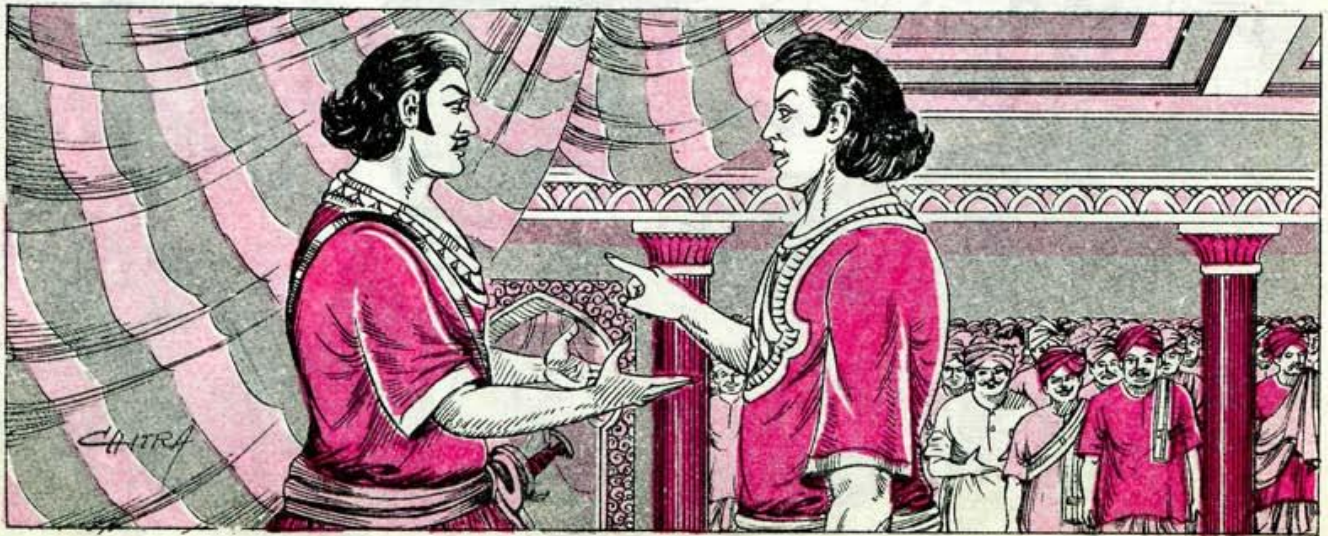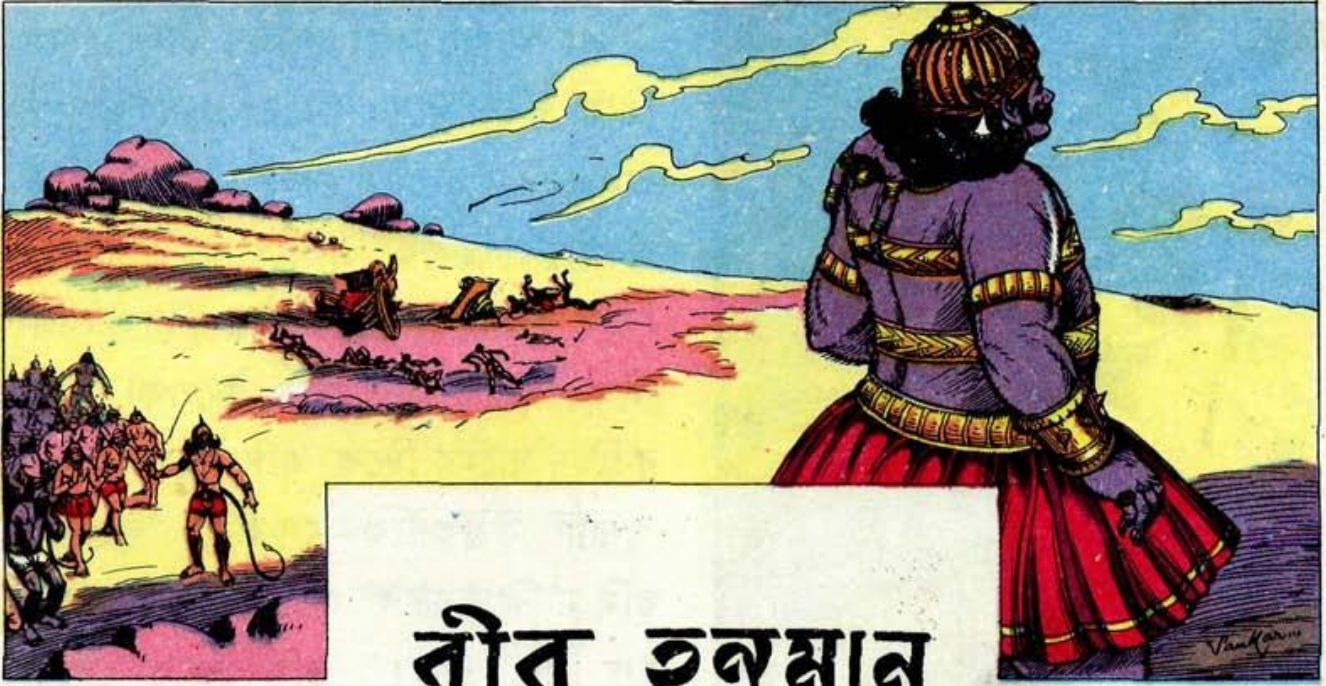
বীর হনুমান

বানরগণ হাজারে হাজারে কুম্ভকর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড় বড় পাথর, গাছ তার উপর ফেলতে লাগল। কিন্তু তাতে কুম্ভকর্ণের কিছুই হল না। কুম্ভ-কর্ণকে যে রোখা যাবেনা তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

অঙ্গদ এবং সুগ্রীবও কুম্ভকর্ণের উপর পাথর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু তাতেও তার কোন ক্ষতি হল না। সে রেগে গিয়ে সুগ্রীবের উপর নিজের শূল ছুঁড়ল। মাঝ পথে সেটিকে হনুমান ধরে কুম্ভকর্ণের দিকে ছুঁড়ে দিল। তা দেখে বানররা আনন্দে ধ্বনি দিতে লাগল। তারপর কুম্ভকর্ণ বড় একটা পাথর সুগ্রীবের উপর ছুঁড়ে মারল। ফলে সুগ্রীব মূর্ছা গেল। তাকে পড়ে যেতে দেখে রাক্ষসরা সিংহনাদ করল। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা সুগ্রীবকে তুলে কুম্ভকর্ণ চলে গেল। তার ধারণা ছিল সুগ্রীবকে নিয়ে গেলে রাম লক্ষ্মণও ঘাবড়ে যাবে। সুগ্রীবকে নিয়ে সে সোজা লঙ্কাপুরীতে চলে গেল।

এসব দেখেও হনুমান ভয় পেলো না। তার বিশ্বাস জ্ঞান হওয়ার পর সুগ্রীব নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে। যা বিশ্বাস করল তাই হনুমান অন্য বানরদের বুঝিয়ে বলল। কাউকে যুদ্ধভূমি থেকে

সে সরতে দিলনা এবং নিজেও সরলনা।

হনুমান যা ভেবেছিল তাই হল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সুগ্রীব টের পেল যে সে কুম্ভকর্ণের কাঁধে রয়েছে। লঙ্কানগরীর বিভিন্ন অঞ্চল সে দেখতে পেল। সুগ্রীব ঝট্ করে কুম্ভকর্ণের নাক ও কান কামড়ে দিল। ফলে তার নাক ও কান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে রেগে গিয়ে সুগ্রীবকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে গেল। কিন্তু তাতে সুগ্রীবের কোন ক্ষতি হল না। সে মুহূর্তে আকাশে উঠে রামের কাছে পৌঁছে গেল।

এই ঘটনার ফলে কুম্ভকর্ণ ভীষণ রেগে গিয়ে যুদ্ধভূমিতে ফিরে এসে দুহাতে বানরদের ধরে খেয়ে ফেলতে লাগল। এই অবস্থায় লক্ষ্মণকে এগিয়ে আসতে হল। তিনি কুম্ভকর্ণের দিকে তীর ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু সেই তীর উপেক্ষা করে কুম্ভকর্ণ রামের দিকে এগিয়ে গেল।

রাম কুম্ভকর্ণকে বললেন, "কুম্ভকর্ণ, তুমি নাকি ইন্দ্রকে জয় করেছ। আমি ইন্দ্র নই, রাম। তুমি জেনে রেখো তোমার মৃত্যু আমার হাতে।"

"রাম, আমি বিরাধ, বালি, মারীচ নই। আমি কুম্ভকর্ণ। বেঁচে থাকতে যত পার আমার উপর আক্রমণ কর। তোমার আক্রমণের পালা শেষ হলে আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব।" কুম্ভকর্ণ রামকে বললেন।

যে তীর সারি সারি শালগাছ ছেদ করেছিল, বালিকে বিদ্ধ করেছিল সেই তীর এখন রাম নিক্ষেপ করলেন কুম্ভকর্ণের উপর। কিন্তু তাতে কুম্ভকর্ণের কিছুই হল না। তখন রাম বায়বাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের যে হাতে গদা ছিল সেই হাত কেটে

পড়ে গেল।

কুম্ভকর্ণ আর্তনাদ করে অন্য হাত দিয়ে বিশাল বৃক্ষ রামের উপর ছুঁড়ে মারল। তখন রাম ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় হাতও কেটে ফেলে দিলেন। দু-হাত কাটা অবস্থায়ও কুম্ভকর্ণ রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সেই অবস্থায় রামের অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের পা কাটা পড়ল। শেষে রামের অস্ত্রে তার মাথাও খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। ওরা রামের কাছে আর যাওয়ার সাহস করল না। বানররা, যে যেখানে ছিল, সব ছুটে এসে রামকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে পূজো করতে লাগল।

রামের হাতে কুম্ভকর্ণের মারা যাওয়ার খবর রাক্ষসগণ রাবণের কাছে পোঁছে দিল। খবরটা শুনেই রাবণ মূর্ছা গেল। তার ছেলেরা দেবান্তক, নরান্তক, তৃশির, অতি-কায় হাউমাউ করে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। কুম্ভকর্ণের ছোট ভাই মহোদর ও মহাপার্শ্ব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর রাবণের মনে

হল লঙ্কাপুরী আর তার হাতে নেই। বানরদের হাতে চলে গেছে। নিজেকে আর লঙ্কাপুরীর রাজা মনে হচ্ছিল না। এখন আর তার মনে সীতার চেয়ে বড় স্থান পেয়েছে কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণের হত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারলে যেন মনে শান্তি নেই। এতে যদি তার মৃত্যু হয়, হবে। বিভীষণকে হারানোর দুঃখও তখন তার মনে জেগেছিল। অনুতাপও হল তার মনে।

রাবণের দুঃখ দেখে তৃশির বলল, "তোমাকে দেখে তিন-তিনটে লোক ভয়ে
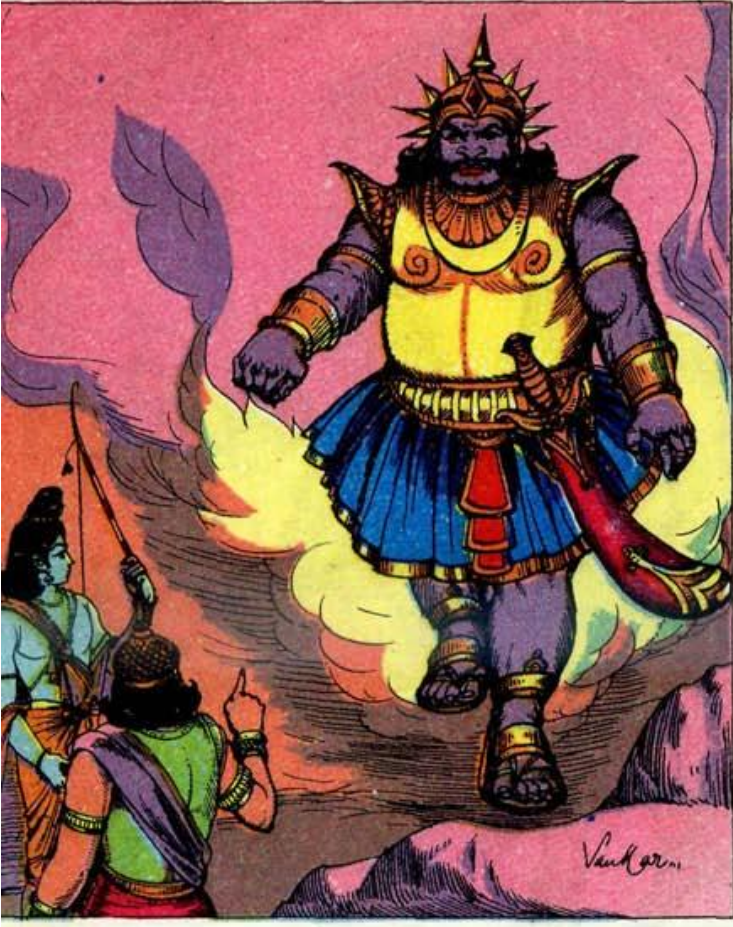
ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে। আর সেই তুমি এখন ভেঙ্গে পড়ছ? আমি যুদ্ধে যেতে চাই। ইচ্ছা করলে আমি একাই রামকে মেরে ফেলতে পারি।"

তার কথা শুনে দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। ওদের সাহস ও উদ্যোগ দেখে রাবণ খুশী হয়ে ওদের জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। আবার নতুন উদ্যোগে রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। নরান্তক রাক্ষসদের মধ্যে বীর ছিল। সে প্রথম আঘাতেই বহু বানরকে মেরে ফেলল। তা দেখে সুগ্রীব অঙ্গদকে পাঠাল ওকে মেরে ফেলতে। অঙ্গদ নরান্তকের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলল।

ঐ অবস্থা দেখে তৃশির, মহোদর ও দেবান্তক অঙ্গদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অঙ্গদ প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে ঐ তিনজন বীর রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। এমন সময় হনুমান এগিয়ে এসে একটা ঘুষিতে দেবান্তককে মেরে ফেলল। অঙ্গদকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল নীল। সে কিছুক্ষণের মধ্যে মহোদরকে সেখানেই মেরে ফেলল।

ঋষভ মহাপার্শ্বকে সহজেই মেরে ফেলতে পারল। মহাপার্শ্বের মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসগণ অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

যেসব বীর রাক্ষস যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে অতিকায় যুদ্ধভূমির দিকে রওনা হল। অতিকায়ের চেহারাটা ছিল যেন ছোটখাটো একটি পাহাড়। তার ঐ বিশাল দেহ দেখে রাম বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই বীর রাক্ষস?"

"এ হল রাবণের ছেলে। নাম অতিকায়। এর মার নাম ধান্যমালিনী। এর ক্ষমতা রাবণের ক্ষমতার কাছাকাছি। ব্রহ্মার অনুগ্রহ লাভ করে এ দিব্যাস্ত্র পেয়েছে। দেবতা ও রাক্ষসদের হাতে অতিকায়ের মৃত্যু নেই। ঐ ধরণের আশীর্বাদ সে পেয়েছে। সে যে কবচ ধারণ করে আছে সেটা আর যে রথে চড়ে আসছে সেটা ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া। ঐ কবচ ধারণ করে আর ঐ রথে চড়ে অতিকায় বহুবার দেবতা ও দানবের হাত থেকে রাক্ষসদের বাঁচিয়েছে। ওকে অবিলম্বে মেরে না ফেললে বানরদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা কমে যাবে।" বিভীষণ রামকে বলল।

ইতিমধ্যেই বানরবাহিনীর দিকে অতিকায় এগিয়ে আসার সময় কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল, সরভ প্রভৃতি তার মোকাবিলা করল। কিন্তু ওরা তার কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। তার তীরে বিদ্ধ হয়ে এক একজন তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল।

অতিকায় ওদের মোকাবিলা করতে করতে এগিয়ে এল রামের কাছে। তাঁকে সে বলল, "যারা যুদ্ধ করতে করতে পালায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা। এমন কেউ কি আছে যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে?"

তার কথা শুনে লক্ষ্মণের গা জ্বালা করল। তার দিকে লক্ষ্মণ এগিয়ে আসতেই অতিকায় তাকে বলল, "লক্ষ্মণ, তোমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে আমার বিরুদ্ধে লড়বে? কি নিয়ে এগিয়ে এসেছ আমার বিরুদ্ধে? প্রাণ এত তুচ্ছ বস্তু নয়। এত তাড়াতাড়ি মরতে চাইছ কেন? যাও, ফিরে যাও।"
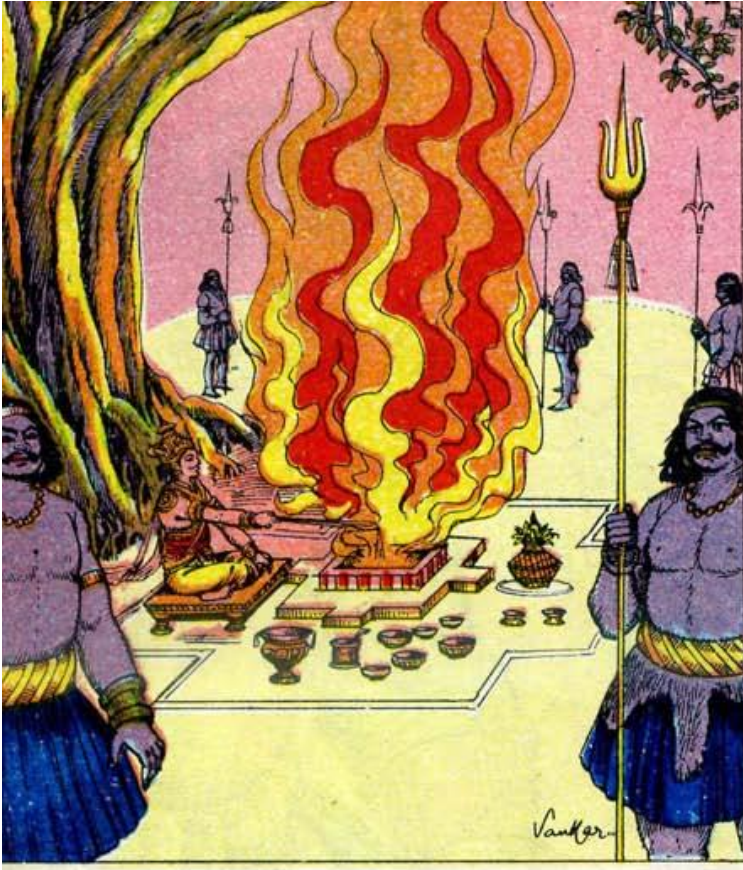
"তুমি যে বীর তা কথায় নয়, কাজে প্রমাণ দাও। তোমার কতবড় ক্ষমতা আছে তা আমাকে একটু দেখাও।" লক্ষ্মণ বললেন।

দুজনের মধ্যে তীর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্মণের তীর গায়ে বিদ্ধ হও-য়ার পর যেন অতিকায়ের যুদ্ধ করার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অতিকায় লক্ষ্মণের উপর দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করল। লক্ষ্মণও তাই করলেন। অতিকায়ের তীরে লক্ষ্মণ ব্যথা পেলেন। কিন্তু তাঁর তীরে অতিকায় ব্যথা পেল না। তখন লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্র অতিকায় শত চেষ্টায়ও রুখতে পারল না। ফলে তার মৃত্যু হল। অতিকায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাবণ দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

বাপকে দুশ্চিন্তগ্রস্ত দেখে ইন্দ্রজিৎ বলল, "আমি বেঁচে থাকতে এত ভাবছ কেন? আমার হাত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচতে পারেনি। আমি একাই রাম লক্ষ্মণকে মেরে ফেলে আসব।" বলে সে যুদ্ধে যেতে তৈরি হল।

বাপের আশীর্বাদ নিয়ে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রওনা হল। তাকে যেতে দেখে বহু বীর রাক্ষস উৎসাহ পেল।

যুদ্ধভূমিতে গিয়ে দিব্যরথ পাওয়ার জন্য ইন্দ্রজিৎ চেষ্টা করতে লাগল। হোম হল। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল রাক্ষসগণ। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার রথ ইত্যাদিকে পূজো করল। তারপর সে আকাশপথে রথ সহ অন্তর্ধান হল।

রথ ও ঘোড়ায় চড়ে রাক্ষসেরা যুদ্ধ-ভূমিতে যুদ্ধ করল। ওরা নানা ধরণের অস্ত্র বানরদের উপর ছুঁড়তে লাগল। ইন্দ্রজিৎ দূর থেকে রাক্ষসদের উৎসাহ

দিয়ে শেষে নিজে যুদ্ধে নামল। তার এক একটি আঘাতে পাঁচ সাতটি বানর মরে যাচ্ছিল। বহু বানরকে মেরে ফেলার পর ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য ছিল গন্ধমাধব, নল, মৈন্দ, গজ, সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ, দ্বিবিদ প্রভৃতিরউপর। ইন্দ্রজিতকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সবাইকে দেখতে পাচ্ছিল।

ইন্দ্রজিৎ যে তীর ছুঁড়ছিল সেই তীর-গুলো রাম লক্ষ্মণের গায়েও বিঁধছিল। এই অবস্থায় রাম লক্ষ্মণকে বললেন, "ইন্দ্রজিৎ যতক্ষণ অদৃশ্য অবস্থায় থেকে যুদ্ধ করবে ততক্ষণ আমরা তাকে মারতে পারবো না। ওর তীর বিদ্ধ হয়ে আমরা যদি পড়ে যাই সে তাতে খুশী হয়ে লঙ্কা-পুরীতে ফিরে যাবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণ হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ মহানন্দে সিংহনাদ করতে করতে লঙ্কায় ফিরে গেল। হনুমান বিভীষণের কাছে এসে বলল, "ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে কত বানর মারা গেছে তার হিসেব জানতে হবে।" তারপর বিভীষণ ও হনুমান যুদ্ধভূমিতে কে মৃত, কে আহত দেখার জন্য ঘোরাঘুরি করতে লাগল। জাম্ববানকে দেখতে পেয়ে বিভীষণ জিজ্ঞেস করল, "বেঁচে আছো?"

জাম্ববান মৃত্যুশয্যায় শুয়ে জিজ্ঞেস করল, "হনুমান বেঁচে আছে?"

"রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞেস না করে হনুমানের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?" বিভীষণ জিজ্ঞেস করল।

"বাবা বিভীষণ, হনুমান বেঁচে থেকে যদি সব বানর মরে যায় তাতে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু হনুমান মরে গিয়ে যদি বানরসেনা থাকে তাতে কোন লাভ হবে না। হনুমান ছাড়া আমাদের যুদ্ধ করার

কোন ক্ষমতা নেই।” জাম্ববান বলল।

পরক্ষণেই হনুমান তার কাছে এসে তার দুটো পায়ে প্রণাম করল।

জাম্বুবান তাকে বলল, “বাবা হনুমান, বানরদের বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার। তুমি ছাড়া ওদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।”

তারপর রাম লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পন্থা জাম্ববান হনুমানকে জানিয়ে দিয়ে পরে বলল, “সমুদ্রের উপর দিয়ে তোমাকে হিমালয়ে যেতে হবে। সেখানে তুমি পর্বতের উচ্চ শিখর, কাঞ্চন, কৈলাস দেখতে পাবে। ঐ দুটোর মাঝখানে ওষধি পর্বত রয়েছে। সেই পর্বতের শিখরে চারটি দিব্যঔষধ আছে। সেগুলো দেদীপ্যমান উজ্জ্বল। ওদের নাম বিশল্যকরণী, মৃত-সঞ্জীবনী, সৌর্ণকরণী ও সন্ধ্যানকরণী এই চারটি ঔষুধ নিয়ে অবিলম্বে ফিরে এসো। এই ওষুধ দিয়ে বানরদের বাঁচানো যাবে।”

তৎক্ষণাৎ হনুমান বায়ুপথে রওনা হয়ে গেল। সে সমুদ্র, পর্বত, নদনদী ও অরণ্য পেরিয়ে হিমালয় পর্বতে পৌঁছাল।

হিমালয় পৌঁছে হনুমান দেখতে পেল বহু শিখর। অসংখ্য আশ্রমও সে দেখতে পেল। ব্রহ্মার স্থান, ইন্দ্রের তপস্যার জায়গা, রুদ্রবানের মোক্ষলাভের স্থান প্রভৃতি বহু স্থান সে দেখতে পেল। ব্রহ্মা যে জায়গায় ইন্দ্রকে বজ্র দিয়েছিল সেই জায়গাও হনুমান দেখতে পেল। পাতাল বিলও হনুমানের নজরে পড়ল। কুবেরের স্থানও সে দেখতে পেল। খুঁজে খুঁজে শেষে হনুমান দেখতে পেল সেই পর্বত যেখানে প্রকাশমান ছিল ওষধি। এরই খোঁজে হনুমানের এত দূরে আসা।

পান্নার ত্যাগ

রাজস্থানের ইতিহাস প্রসিদ্ধস্থান হল মেবার। ১৬০০ শতাব্দীর শুরুতে সঙ্গরাণা মেবারের রাজা ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল কঠোরে কোমলে মেশানো।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ছেলেরা তাঁর উপযুক্ত হল না। রত্ন নামক এক ছেলে অন্য এক রাজকুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিল। বাপের মৃত্যুর পর রাজা হল বিক্রমজিৎ। বিলাসে, উল্লাসে প্রচুর ধনসম্পত্তি সে নষ্ট করে ফেলল।
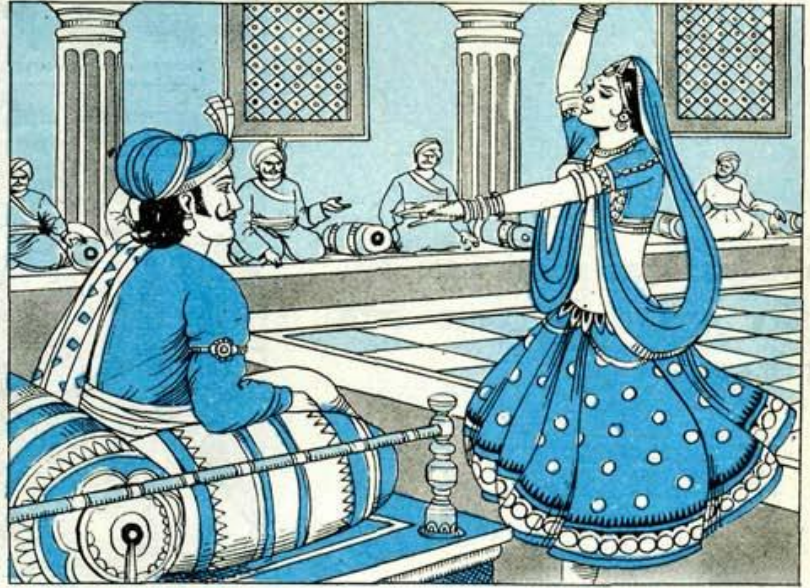
মেবারে অরাজকতা দেখা দিল। দিল্লীর মোঘলদের নজরে পড়ল মেবার। ওরা মেবার দখল করার ফন্দি আঁটল। এই অবস্থার মধ্যে রাজদরবারের বন্বীরকে হাত করে বিক্রমজিৎকে সিংহাসন থেকে সরানোর চক্রান্ত করল। বন্বীর ছিল পৃথ্বিরাজের জারজ সন্তান।
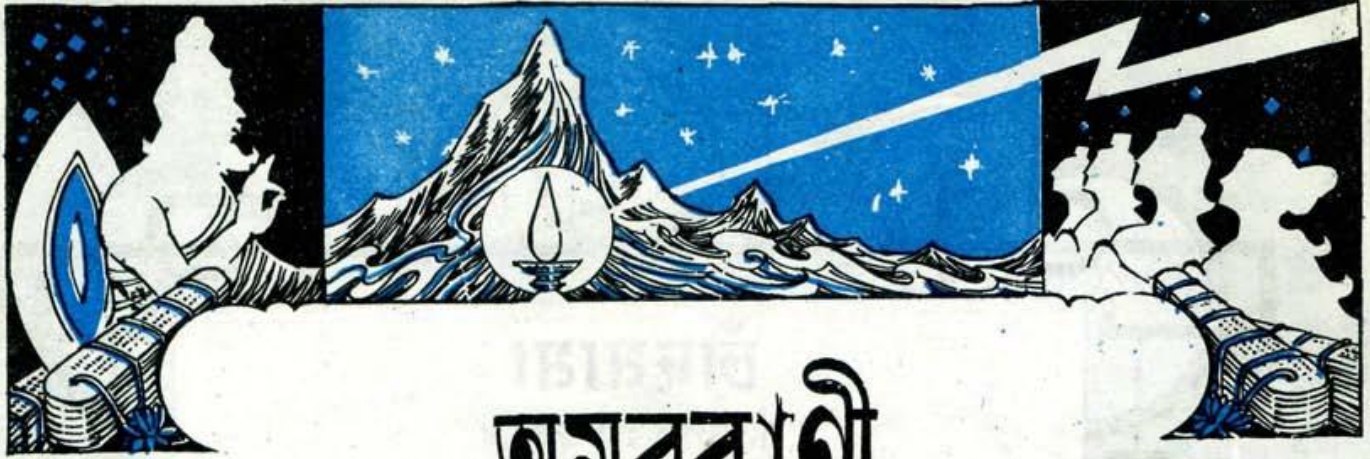
অমরবাণী

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি,
যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ
যস্যার্থাস্ সপুমান্ লোকে,
যস্যার্থাস্ স চ পণ্ডিতঃ। ॥ ১ ॥

[ধন যার আছে তারই আছে মিত্র, ধন যার আছে তারই আছে বন্ধু, ধন যার আছে সেই হল পুরুষ, সেই হল পণ্ডিত।]

যস্যার্থাস্ স চ বিক্রান্তো,
যস্যার্থাস্ স চ বুদ্ধিমান,
যস্যার্থাস্ স মহাভাগো,
যস্যার্থাস্ স মহাগুণঃ। ॥ ২ ॥

[ধন যার আছে সেই হল পরাক্রমশালী এবং বুদ্ধিমান, এবং অদৃষ্টবান, সেই গুণবান।]

যস্যার্থা ধর্ম কামার্থাঃ
তস্য সর্বম্ প্রদক্ষিনম্;
অধনে সার্থকামেন
সার্থশ্ শক্যো বিচিন্বতা। ॥ ৩ ॥

[ধন যার আছে তার ধর্ম কার্যাবলী সিদ্ধ হয়, ধন যার নেই তার ইচ্ছা-গুলো পূরণ হয় না।]

একদিন হঠাৎ আক্রমণ করে বন্বীর বিক্রমজিৎকে মেরে ফেলল। নিরুপায় হয়ে তার বন্ধুরা পালিয়ে বাঁচল।

অতি দ্রুত বিক্রমজিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল। সারা মেবারে শোক পালিত হল।

বিক্রমজিতের পুত্র ছিল নাবালক। তার নাম উদয়। পান্না নামক এক অতি বিশ্বাসী মহিলার উপর ভার পড়েছিল উদয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করার। উদয়ের বয়সের সমান বয়সী ছেলে পান্নার ছিল। অন্তপুরে পান্না দুজনকেই লালন পালন করত।

পান্না রাজার অন্তরঙ্গ সেবকের কাছে প্রথম জানতে পারল তার রাজার হত্যার খবর। পান্না আরও জানতে পারল যে বন্বীর নাবালক রাজকুমার উদয়কেও মেরে ফেলবে।
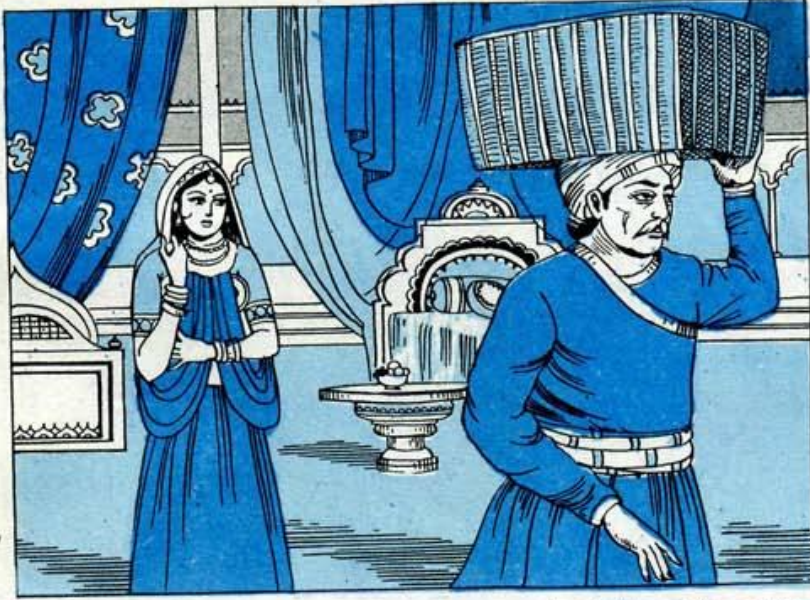
পান্না তৎক্ষণাৎ ঐ সেবককে একটি কাজ করতে বলল। তার কথা মত রান্নাঘর থেকে ঐ সেবক একটি চার-কোণা ঝুড়ি এনে ঐ ঝুড়িতে উদয়কে শুইয়ে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেল।

সেবকের চলে যাওয়ার পরমুহূর্তেই পান্না উদয় যে বিছানায় শুতো সেই বিছানায় নিজের ছেলেকে শুইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ কাটতে না কাটতেই খুনী বন্বীর পান্নার ঘরে ঢুকে তরবারি নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল, "রাজকুমার উদয় কোথায় ?"

পান্না মনে মনে শপথ করেছিল রাজকুমারকে বাঁচানোর। রাজকুমার চলে গেছে বলা যায় না, বলতে হয় তাকে কেউ নিয়ে গেছে। কিন্তু তা বললে তৎক্ষণাৎ বন্বীর লোক পাঠিয়ে উদয়ের খোঁজ পেয়ে যাবে। তাই পান্না নিজের ছেলেকেই রাজকুমার বলে জানাল। পরক্ষণেই বন্বীরের তরবারি পান্নার বাচ্চা ছেলের বুকে ঢুকে গেল।

ঐ সেবক, কথা অনুযায়ী নদীর তীরে গিয়ে উদয়কে নিয়ে পান্নার জন্য অপেক্ষা করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পান্না সেখানে পৌঁছে গেল। উদয়কে নিয়ে সে গেল কোমল্মের রাজভবনে। সেখানে উদয় বড় হল। তার নাম উদয় সিং। বড় হয়ে উদয় সিং বন্বীরকে সরিয়েছিল। ইতিহাসে পান্নার ত্যাগের মত অন্য কোন ত্যাগের দৃষ্টান্ত নেই।

গল্পের নামকরণ প্রতিযোগিতা

এই গল্পের ভাল নাম দিয়ে ২৫ টাকা জিতে নিন

?

দশজন ব্যবসাদার শহরে অনেক টাকা রোজগার করে ফেরার সময় বনপথে তিনটে চোরের সামনে পড়ে গেল। ওদের হাতে হাতিয়ার ছিল। ওরা ঐ অস্ত্র দেখিয়ে ব্যবসাদারদের প্রাণের ভয় দেখাল। ওদের কাছে যা ছিল ওরা সব কেড়ে নিল। শেষে ওদের নেংটি পরে নাচতে ও গাইতে বলল।

ওদের নাচতে বলে ঐ তিনজন চোর নিজেদের অস্ত্র পাশে রেখে ব্যবসাদারদের নাচ দেখতে বসল।

ব্যবসাদারদের কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। তবে ওরা সংখ্যায় ছিল দশ জন। চোরের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন। তিনজনেরই অস্ত্র মাটিতে রাখা ছিল। ওদের মধ্যে চতুর ব্যবসায়ীটি এইঅবস্থা লক্ষ্য করে নাচতে নাচতে গাইতে লাগল:

"তিন তিরিক্কে নয়
একুনে আছি দশ।"

বার বার এই গান করার ফলে অন্য ব্যবসাদাররা এই গানের অর্থ বুঝল। চোরগুলো ভাবছিল এটা নিছক গান। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক একটা চোরকে তিনজন করে ব্যবসাদার নাচতে নাচতে ঘিরে জড়িয়ে ধরে ফেলল। তখন ঐ ব্যবসাদারটি চোরদের হাত-পা বেঁধে দিল। পরে ওদের প্রহরীদের হাতে দিয়ে দেওয়া হল।

* * *

উপরের এই গল্পের ভালো একটা নাম পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতে হবে। কার্ডের উপরে 'গল্প-নামকরণ প্রতিযোগিতা' লিখতে হবে। কার্ড পাঠানোর ঠিকানা:
Chandamama (Bengali), 2 & 3 Arcot Road, Madras-600 026

পোস্টকার্ড ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পৌঁছানো চাই। এই কার্ডে ফটো নামকরণ লেখা চলবে না। ফলাফল এপ্রিল '৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ডিসেম্বর '৭৬ গল্প নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গল্পের নাম: সুখ

পুরস্কার পেয়েছেন: বঙ্কিম চক্রবর্তী, চাকপোতা, আমতা, হাওড়া।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২৫ টাকা

পুরস্কৃত নাম এপ্রিল '৭৭-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

ফটো নামকরণ দু'চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই।

২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৭-মধ্যে পৌঁছানো চাই। তার পরে পৌঁছানো চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না।

জয়ী প্রতিযোগীকে ঐ দুটো নামের জন্য মোট ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

দুটো ফটোর নামকরণ একমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কার্ডে অন্য কোনো বিষয় লেখা চলবে না।

Chandamama Photo Caption Competetion, Madras-600026

ডিসেম্বর '৭৬ ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম ফটোর নাম ঃ কাপড়ে ফুল তুলি

দ্বিতীয় ফটোর নাম ঃ সুতোয় মালা গাঁথি

পুরস্কার পেয়েছেন ঃ সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ বাজাজ মহল, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যে পাঠানো হবে।

Printed by B. V. REDDI at Prasad Process Pvt. Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for CHANDAMAMA CHILDREN'S TRUST FUND (Prop. of Chandamama Publications) 2 & 3, Arcot Road, Madras 600 026; Controlling Editor: NAGI REDDI

দেশ এগিয়ে চলেছে

আরও স্বাচ্ছন্দ্য চাই, চাই আরও গতিবেগ...

ভারতীয় রেলপথে প্রত্যহ দশ হাজারেরও বেশি রেলগাড়ী চলাচল করে। এর মধ্যে আছে দূর-পথের যাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর 2,570 টি শোবার বগী। রেলগুলি সর্বত্র সময়মত চলাচল করছে। মালগাড়ীগুলি প্রতিদিন 5.5 লক্ষ টন পরিমাণ আবশ্যক মালপত্র বহন করছে।

আপনারা ভারতীয় রেলওয়েকে আরও ভালভাবে সেবা করতে সাহায্য করতে পারেন। বিনা-টিকিটের যাত্রীদের অবৈধ ভ্রমণ বন্ধ করুন; রেলের সাজ-সরঞ্জাম যাতে চুরি না যায়, সেদিকে কড়া নজর দিন।

দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম—আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে

davp 75/455

জেমসের মজার আসর
১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!
যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?
?
3
5
8
13
22
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
শিগ্‌গীর!
তোমাদের উত্তর আর
সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের
একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক
উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।
হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের
উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept. A–27
Post Box No. 56, Thane 400 601.
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস
CHAITRA-C-69 BEN
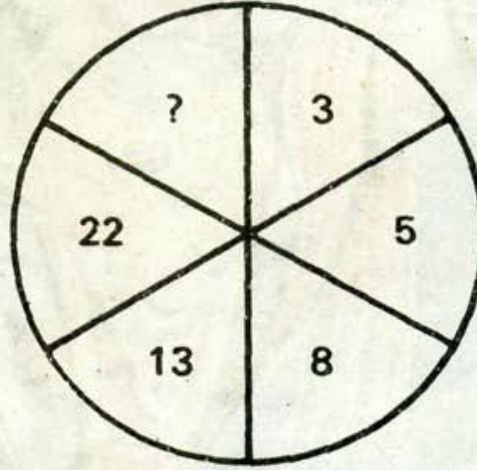
CHANDAMAMA (Bengali) FEBRUARY 1977 Regd. No. M. 9100

মিত্রলাভ

মিত্রলাভ

বিয়াল্লিশ

সোমিলক নিজের দেশের দিকে রওনা হল। সূর্য ডুবু ডুবু। এমন সময় সেই বটগাছ সে দেখতে পেল। নিজের অবস্থা সম্পর্কে আবার তার মগজে নানা কথা জাগল। এই সেই গাছ যে গাছের নীচে সে স্বপ্ন দেখেছিল।

স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে তার তন্দ্রা এল। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। আবার স্বপ্ন দেখল। একজন অন্যজনকে প্রশ্ন করছে, "কর্তা, সোমিলককে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়ে দিলে কেন?"

জবাবে অন্যজন বলল, "কর্ম, যে যত কাজ করে তাকে তার প্রাপ্য ফল দেওয়া আমার ধর্ম। এটা যদি ঠিক মনে না কর তার কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিতে পার।"

ঘুম ভেঙ্গে গেলে সোমিলক দেখল তার থলিতে কানা কড়িও নেই। তখন সে ভাবল, "এই যদি হয়, তাহলে আমার জীবনের স্বার্থকতা কি! আমি এই গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করব।" তারপর সে আশেপাশে যত লতা ছিল সেগুলো পাকিয়ে গলায় জড়িয়ে ঝুলতে যাবে এমন সময় দিব্যরূপধারী আকাশ থেকে বলল, "সোমিলক, আত্মহত্যা করো না। আমিই তোমার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তুমি তোমার ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যে কষ্ট করেছ তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি কি বর চাও বল।"

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

সোমিলক বলল, "অগাধ সম্পত্তি চাই।"

"বন্ধু, তোমার ঠিকমত ভাত-কাপড় জোটেনা, অগাধ সম্পত্তি চাইছ কি করবে?" কর্তা প্রশ্ন করল।

"যাই করি, আমার কিন্তু অগাধ সম্পত্তি চাই।" সোমিলক বলল।

"ঠিক আছে তুমি আবার বর্ধমানপুরে যাও। সেখানে ধনগুপ্ত এবং ভুক্তধন নামে দুজন ব্যবসাদার আছে। ঐ দুজনের চাল-চলন দেখে তুমি যার মত জীবন যাপন করতে চাইবে তার মতই জীবন কাটাতে পারবে।" বলে কর্তা অন্তর্ধান হল।

সোমিলক বর্ধমানপুরে গেল। অনেক খুঁজে খুঁজে সে ধনগুপ্তের খোঁজ পেল। ধনগুপ্তকে কেউ চিনত না। কারণ সে কোনদিন কোন ব্যাপারে খরচ করত না।

সোমিলক ধনগুপ্তের বারান্দায় বসল। খাওয়ার সময় ধনগুপ্তের বউ এবং বাচ্চারা এসে বার বার ওকে তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। সেই সময় ধনগুপ্ত বাড়ীতে ছিল না। সোমিলক বলল, "আমি সন্ধ্যার সময় এসেছি। আমি অতিথি। আমাকে খাওয়ানো তোমাদের কর্তব্য।"

অনেক কথা কাটাকাটির পর সোমিলক অল্প খাবার পেল।

সোমিলক ক্লান্ত ছিল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম পেয়ে গেল। আবার সেই দুজনের আবির্ভাব ঘটল স্বপ্নে।

"কর্তা, খাওয়ানোর ফলে ধনগুপ্তের তো কিছু খরচ হয়ে গেল। এভাবে খরচ করানো কি তোমার উচিত হয়েছে?" বলল কর্ম।

"কর্ম, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। তবে যা খরচ হয়ে গেছে তা পূরণ করা তোমার কর্তব্য।" বলল, দ্বিতীয়জন।

ঘুম ভাঙ্গতেই সে দেখতে পেল ধনগুপ্ত

আসছে। খাওয়ানোর কথা শুনেই ধনগুপ্তের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তার শরীর মন ভেঙ্গে গেল। তার এই অবস্থা দেখে সোমিলক চলে গেল ভুক্তধনের বাড়িতে। ওর বাড়ি খুঁজে পেতে সোমিলকের একটুও কষ্ট হয়নি। কারণ ভুক্তধনের বাড়ি সবাই চিনত।

তাকে দেখেই ভুক্তধন সাদরে বাড়ির ভেতরে বসাল, স্নানের ব্যবস্থা করল, নতুন জামাকাপড় পরতে দিল, পেট ভর্তি ভাল ভাল খাবার খেতে দিল।

রাত্রে চমৎকার নরম বিছানায় ঘুমিয়ে সোমিলক স্বপ্ন দেখল। "কর্তা, সোমিলকের জন্য ভুক্তধনের অনেক অর্থ খরচ করিয়েছ। বেচারার হাতে কালকের সংসার চালানোর পয়সা নেই। এমন কি আজকে ভুক্তধন যে পয়সা খরচ করেছে তাও অন্যের। আজকে যাহোক করে চলল। কালকে কি হবে?" কর্ম বলল।

"দেখ কর্ম, কাল সকালেই রাজার লোক অনেক উপহার এনে দেবে ভুক্তধনকে।" বলল কর্ম।

পরের দিন সকালে সোমিলক দেখতে পেল রাজার লোক এসে ভুক্তধনকে বহু উপহার দিচ্ছে। তখন সোমিলক ভাবল, "এই ভুক্তধনের কাছে তত টাকাপয়সা না থাকলেও দুজনের মধ্যে একেই ভালো বলা চলে। ধনগুপ্ত যেভাবে দিন যাপন করে সেভাবে জীবন কাটানোর কোন মানে হয় না। যে একটু দান ধর্ম করে না তাকে মানুষ বলা চলে না।"

তারপর সোমিলক কর্তাকে স্মরণ করে বলল, "ঠাকুর, আমি ভুক্তধনের মত বাঁচতে চাই। ধনগুপ্তের মত নীচ জীবনযাপন আমি করতে চাই না।"

কর্তা সোমিলককে অগাধ সম্পত্তি দিল।